একক ৪ ❑ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

৪.২.১ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি।

৪.২.২ সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা

৪.২.৩ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লব

৪.২.৪ প্রথম পর্ব ঃ ১৯০৫-১৯১৪

৪.২.৫ দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৯১৪-১৯২০

৪.২.৬ তৃতীয় পর্ব ঃ ১৯২০-১৯৩৯

৪.৩ সারাংশ

৪.৪ অনুশীলনী

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি ভারতীয় সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। আপনি জানতে পারবেন সংগ্রামী বিপ্লব আন্দোলন, বিভিন্ন পর্যায়ে, কীভাবে, কোন সময়ে, কোন অঞ্চলে, কেমন করে আন্দোলিত হয়েছিল।

বিপ্লবীদের চিন্তাভাবনা, আদর্শ, কার্যক্রম, বিভিন্ন বিপ্লবী ব্যক্তিত্বদের কথা, তাঁদের সফলতা ও ব্যর্থতা, বিপ্লবী আন্দোলনে মেয়েদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা এই আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে।

৪.১ প্রস্তাবনা

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা। প্রারম্ভিক আলোচনায় কি ভাবে উনিশ শতকের ব্যাপ্তিতে নানা পরিস্থিতি, ঘটনা এবং ব্যক্তিত্বের মতাদর্শের সমন্বয়ে জাতীয়তাবোধ, এবং জাতীয় চেতনা দানা বেঁধেছিল তা বলা হয়েছে।

৪.২ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

জাতীয়তাবাদ এই সংজ্ঞাটির উদ্ভব হয় উনিশশতকে। একই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আচার, ব্যবহার, ভাষা প্রচলিত সংস্কার ও সংস্কৃতির সাযুজ্য থেকে একাত্মবোধের অনুভব থেকে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। আবার সেই একাত্মবোধের অনুভব যখন একটি বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়, অর্থাৎ সেই সব মানুষেরা, যারা একটি ভাষা বা একটি সংস্কৃতি ও একই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে একটি অঞ্চলের মধ্যে পিতৃ পরম্পরায় একত্রিত হয়ে বসবাস করে, সেই অঞ্চলটি ঘিরে তাদের একত্রিত মনোভাবটি এবং সেই একাত্মবোধকে জাতীয়তাবোধ বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, আরেকটি ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে শুরু হয়েছিল। এখানে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এই উন্মেষের দুটি ধারা ছিল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি এবং দেশীয় শাসক শ্রেণীর দ্রুত পতন ও ইংরেজ শক্তির ক্রমশ উত্থান, ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফলে ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর শ্রেণী থেকে শুরু করে সামান্য চাষী, জঙ্গলবাসী মানুষদেরও অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে। পরিস্থিতি যত অসহনীয় হয়ে ওঠে, ততই নিরুপায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ, অসন্তোষ, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে দানা বাঁধতে থাকে, এবং আলোড়ন তৈরী করে। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে এই ধরনের বিক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রকাশ অনেক সময়ে সশস্ত্র লড়াই-এর রূপ নিয়েছিল। বিদেশী শাসন সমস্ত দূরাবস্থার কারণ, এই প্রাথমিক বোধ এবং সেই শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা থেকে একধরনের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধারার জাতীয়তাবোধ, পশ্চিমী শিক্ষাও সংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে শিক্ষিত, আধুনিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম ছিল মানবতাবাদী মূল্যবোধ। নতুন চিন্তাধারার মখপাত্র ছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্যরা। এরা প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূর করার আন্দোলন তৈরী করেছিলেন। আন্দোলনগুলি সফলও হয়েছিল। তারই সঙ্গে নারীশিক্ষা প্রচার ও প্রসার সমকালীন ইওরোপের নতুন নতুন চিন্তাধারাগুলি ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছিল। বাংলা ছাড়াও মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, তামিল অঞ্চলে নানাধরনের সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদ এবং স্বাধীনতার তত্ত্ব, ঊনিশ শতকের ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের সাফল্য, শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে উদ্দীপ্ত করে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আধুনিক জীবনের আস্বাদে আপ্লুত ও পরিতৃপ্ত মধ্যবিত্ত ভারতীয় প্রথমে ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজ শাসকদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে অসমনীতি এবং ঔপনিবেশিকতার রূঢ় বাস্তবতা তাদের সচেতন করে তোলে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষ থেকে তৈরী হল রাজনৈতিক সচেতনতা এবং ভারতবর্ষ, ভারতীয়ত্বকে ঘিরে একাত্মবোধ;

এই একাত্মবোধ থেকেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হল। কাগজপত্রে লেখালেখি, সাহিত্য রচনা, সংগঠন এবং বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আত্মসচেতন মধ্যবিতত শ্রেণীর প্রতিবাদ গড়ে উঠতে থাকে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং আন্দোলনের দুটি ধারার মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিরোধিতা এবং স্বাধীনতার স্পৃহা।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই এর মাধ্যমে জাতীয়তাবোধের প্রথম অস্ফুট প্রকাশ হয়েছিল বহু আগে থেকেই। ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং ভারতবাসীর স্বার্থের সংঘাতের মধ্যেই আমরা প্রথম ধারার জাতীয়তাবোধ অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়াস দেখতে পাই। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের গোড়ার দিকে এ ধরনের বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন অস্ত্রে লড়াই এর হদিস পাওয়া যায়। ইংরেজ কোম্পানির যথেচ্ছাচার ও শোষণ ভারতীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যকে ধ্বংস করেছিল। কৃষক ও কারিগর শ্রেণী থেকে শুরু করে বণিক, ব্যবসাদার, সচ্ছল, সম্পন্ন তালুকদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আদিবাসী, উপজাতি গোষ্ঠীগুলি ও কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণের বাইরে থাকেনি। নিম্নবর্গীয় মানুষের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল কোম্পানির আমলে, নানা বিদ্রোহ, অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। গোটা আঠারো শতক এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডাদের লড়াই, অন্যদিকে খরায়েজি, ওয়াহাবি আন্দোলন এমনকি মহাবিদ্রোহের আগের এবং পরের দশকের কৃষক বিদ্রোহগুলি, ও নীল বিদ্রোহকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মুক্তির সশস্ত্র লড়াই বললে সম্ভবতঃ ভুল বলা হবে না।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পষ্ট এবং পরিণত ধারণা না থাকলেও এই সব আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা অত্যাচারী বিদেশীকে চিহ্নিত করে নিয়েছিল। জাতি, ধর্ম, অঞ্চল এবং ঐতিহ্য এর কোন একটি বা সবটাই নিয়ে একত্রিত হয়েছিল বা একাত্মবোধ করে একজোট হয়ে লড়াই করেছিল। এই সব সশস্ত্র আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা পরবর্তীকালের সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাভাস পাই। অর্থাৎ অস্ত্রের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অত্যাচারের মোকাবিলা করার চেষ্টা আগেই হয়েছিল, একথা মনে রাখা দরকার।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি সর্বব্যাপী আন্দোলন। মহাবিদ্রোহে, জাতীয় চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৫৭ সালের ১৫ই আগস্ট বেনারস থেকে ষাট মাইল উত্তরে আজমগড় শহরে দ্বিতীয় শাহ আলম বাদশার নামে একটি ঘোষণা পত্র জারি করা হয়। আজমগড় ঘোষণাপত্রে বিদেশী অপশাসনের অপসারণের পর স্বাধীন দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে একই বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত করার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। সাধারণতঃ উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের সংগঠনের রূপায়ণের Blue Print নিয়ে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠে। সুতরাং সেদিক থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ জাতীয় চেতনার প্রথম প্রকাশ এবং স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বলা

যেতে পারে।

উনিশ শতকের প্রথম দুই এবং তিন শতকের আন্দোলনগুলি ও ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতীয় সংগ্রামী জাতীয়তা বাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। পরবর্তী কালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাও এখান থেকে তৈরী হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ঘটনার সমাবেশের মধ্য থেকে সংগ্রামী বা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ধারা ক্রমশ স্পষ্ট রূপ দিতে থাকে।

অবিরাম অর্থনৈতি শোষণের কারণে উনিশ শতকের শেষাশেষি দারিদ্র, কর্মহীনতা, কৃষি ও শিল্পে অনুন্নতি এবং সর্বব্যাপী হতাশা সর্বভারতীয় চেহারা নিয়েছিল। ইংরেজ শাসনের হিতকারী রূপটি ক্রমশ ভারতীয় মন থেকে সরে যাচ্ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত স্বরূপ কী তা বুঝে নিতে আর কোন সংশয় ছিল না। এই সময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলিতে শাসনগত এবং তাত্ত্বিকভাবে শাসনক্ষমতা জোরদার করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্র থেকে শুরু করে আর্থিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী নীতির দাম্ভিক প্রয়োগ দেখা যায়। পার্কে, রাস্তায়, স্টেশনে, রেলগাড়ীতে কালোচামড়ার প্রতি ঘৃণা এবং শারীরিক নিগ্রহ ঐ সাম্রাজ্যবাদী নীতির বাহ্যিক প্রকাশ ছিল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সবল শক্তিমান ও সতেজ স্বাস্থ্যবান ভারতীয় চরিত্র তৈরির প্রয়াস দেখা গেল। অর্থাৎ সবল ইংরেজের সমকক্ষ এমনকি প্রতিপক্ষ সবল ভারতীয় এমন বিন্যাসের আকাঙ্খা তীব্রতর হল।

উনিশ শতকের পরবর্তী অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে প্রধানত বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে শরীরচর্চার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। ব্যায়ামাগার, এবং আখড়ায় ব্যায়াম ও শরীর চালনার মধ্য দিয়ে সবলদেহ এবং লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি ইত্যাদি নানা অনুশীলনের মাধ্যমে শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও অস্ত্রচালনার কুশলতা তৈরী করার প্রয়াস তীব্রতর হয়ে ওঠে। ভারতীয় মনে প্রাচীন কালের শক্তিমান যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি আদর্শ হয়ে ওঠে।

১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ সালের মাঝের বছরগুলিতে নতুন রাজনৈতিক প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। স্পষ্ট এবং তীব্রতর রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন একদল তরুণ বুদ্ধি জীবী দল তৈরী হয়েছিল—এদের কাছে উনিশ শতকের প্রথমদিকের সংগঠনগুলির প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মনে হয়েছিল এই সংগঠনগুলি ভিত্তি এবং গঠন দুইই সংকীর্ণ ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রও সীমিত। যেমন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তার আগেকার ব্রিটিশ বিরোধী ধার হারিয়ে ফেলে শুধুমাত্র জমিদার শ্রেণীর সুবিধা রক্ষার ব্যাপারেই আগ্রহী থাকছিল, বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন বা মাদ্রাজ নেটিভ এ্যাসোসিয়েশনগুলিও বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলার ফলে ক্রমশঃ গুরুত্ব হারাচ্ছিল। বাংলায় নতুন প্রজন্মের রাজনীতিজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তৈরী করলেন (১৮৭৬)। ১৮৮৪ সালে এম. বীর রাঘবাচারি, জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পি. আনন্দবাবলু এরা সবাই মিলে শুরু করলেন মাদ্রাজ মহাজন সভা। ১৮৮৫ নতুন ঘরানার রাজনীতির প্রতিনিধি কে.টি. তেলাঙ্গ এবং ফিরোজ শাহ মেহতার

নেতৃত্বে তৈরী হল বোম্বে প্রেসিডেন্ট এ্যাসোসিয়েশন। এমনকি পুরোনো সংগঠনগুলির মধ্যে পুনা সার্বজনিক সভাও নতুন সংগঠন-গুলির পাশাপাশি বেশ কিছু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু হয়েছিল— দি হিন্দু, ট্রিবিউন, বেঙ্গলি, মারাঠা এবং কেশরী। বাংলা ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা আগেই প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৮৭৮ সালের সংবাদপত্রের নিষেধাজ্ঞা আইন কার্যকরী হলে অমৃতবাজার রাতারাতি ইংরেজী পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর ও নতুন সাহসী রাজনীতির প্রকাশভঙ্গী বলে মনে করতে হবে।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশঃ বাড়ছিল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে লর্ড লিটনের সময়কালে পরপর কতগুলি ঘটনা ভারতীয় রাজনীতির তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়, গতিও দ্রুততর হয়। অস্ত্র আইন, সংবাদ পত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা, দ্বিতীয় আফগান অভিযান উপলক্ষে বিশাল অর্থব্যয়, যা সেই সময়ের দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অনাবশ্যক এবং নিষ্করুণ বলে প্রতিটি সচেতন ভারতীয়র মনে হয়েছিল। এইসব ঘটনা এবং আশির দশকের চা বাগান সংক্রান্ত আইনগুলি, ও ইলবার্ট বিল উপলক্ষ করে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিরোধ, ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাগুলি জাতীয় চেতনাকে সংহত ও তীব্রতর করেছিল। বুদ্ধিজীবীরা একটি সর্বভারতীয় মঞ্চ ও সংগঠনের কথা ভাবছিলেন।

ইংরেজ ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনায় ভারতীয় জাতির কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাদের কাছে ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক উপাখ্যান মাত্র, নানা গোষ্ঠী, নানা জাতির বসবাসের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র বিশেষ। রিসলি (H.H. Risley Census Commissioner এবং ethmologist) তার পিপল অফ ইন্ডিয়া (Herbert Risley, The people of India London 1915) ভারতীয়দের এ ভাবেই মনে করেছিলেন। তার মনে বহিরাগত শক, কুষান, আরব, মোগল এই সব বহিরাগত বিদেশীরা এদেশের আদি মানুষদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে তাদের শক্তি এবং বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে দুর্বল এবং নির্জীব হয়ে যায়। এমন কি রিসলির মতে ভারতীয়দের দুভাগে ভাগ করা যায়, সবল এবং পুরুষোচিত গুণ ও শক্তি সমন্বিত পাঞ্জাবী, পাঠান ও অন্যান্য উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দারা এবং নারীজনোচিত কমনীয়, দুর্বল এবং ভীরু বাঙালী এবং অন্যান্যরা। এভাবে ভারতীয়দের কয়েকটি কাঠামোর মধ্যে আটকে দেওয়ার যে প্রবণতা তৈরী হল, তার প্রতিবাদেই সম্ভবত শরীর চালনা ও ব্যায়ামচর্চার প্রাবল্য দেখা গেল। সুস্থ সবল শরীর এবং নির্ভীক সাহসী মনের তরুণ ভারতীয় তৈরী হবে যারা ইংরেজ শাসনের মুখোমুখি হতে পারবে— এমন ধারণা থেকে নুতন ধরনের সংগঠন তৈরী হচ্ছিল। এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৮৫ সালে শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত ভলান্টিয়ার্স কোরে Volunteers Corpe ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি করার জন্য জোরদার আন্দোলন হয়েছিল।

১৮৮৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, বোম্বেতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হল। সর্ববিধ ব্যবধান ও প্রভেদ সত্ত্বেও রিসলির বক্তব্যকে অতিক্রম করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পরিণত হওয়ার মুহূর্তে পৌঁছেছে এমন তত্ত্ব পাওয়া গেল, বালগঙ্গাধর তিলক এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লিখলেন A Nation in Making। জাতীয় কংগ্রেস, সদ্য গঠিত জাতীয়তার মঞ্চ এবং মুখপত্র একাধারে দুই। উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন সর্বভারতীয় ঐক্য এবং জাতীয় চেতনার উদ্রেক করাই হল জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে সকল রকম ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও ব্যবস্থা দূরে সরিয়ে জাতীয় কংগ্রেসকে পুরোপুরি একটি ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার ইতিহাস থেকে কিছু মানুষের সমাবেশ এই অর্থে জাতীয় কংগ্রেসের ধারণা নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনায় সচেতন করা। বিক্ষোভ, অসন্তোষ এবং দাবীগুলিকে একটি সংগঠিত চেহারায় উপস্থাপন করা এবং বক্তৃতা, লেখাপত্র, সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরিচিত করা। কংগ্রেসের অধিবেশনগুলি পার্লামেন্টের মত কাজ করত। আলোচনা, বিতর্ক এবং ভোটগ্রহণের মধ্য দিয়ে সভার কাজ চালনা করা হত।

প্রথম থেকেই কংগ্রেস ছিল একটি আন্দোলন, কোন দল নয়। অক্টাভিয়ান হিউমকে প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকায় প্রয়োজন ছিল এই কারণে, যে হিউমের মত একজন প্রাক্তন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, না হলে এই আন্দোলন প্রথমেই চেপে দেওয়া হত—হিউম সম্পর্কে গোখ্‌লের এই অভিমত যথার্থ (W. Wedderfurn, Aurn Octavian Hume, PP 63-64, Bipan Chandra and others India is struggl for Independence, P 81)। হিউম এবং অন্যান্য উদারনৈতিক ইংরেজদের উপস্থিতিতে ইংরেজরা কংগ্রেস আন্দোলনকে একটি সীমাবদ্ধ এবং নিরাপদ পরিস্থিতিতে দেখতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস উগ্র এবং অনিয়ন্ত্রিত যাতে না হয়, এবং হিউম কংগ্রেসকে নিরাপদে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, ইংরেজ সরকার যেমন ভাবলেন, তেমনি কংগ্রেসের আদি নেতারা হিউমকে দেখলেন, অগ্নিসংযোগকারী বা উত্তাপ পরিবাহী হিসাবে। অর্থাৎ হিউম এ ধরনের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যতের আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরী করে দিলেন একথা সমসাময়িক নেতারা মনে করেছিলেন।

৪.২.১ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার পেছনে কংগ্রেসের প্রথম দিকের কাজকর্মের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এছাড়া, দ্রুত পরিবর্তিত, উনিশ শতকের শেষের দুই দশকের সামাজিক প্রেক্ষাপট ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনা ও আদর্শ গড়ে ওঠার জন্য দায়ী ছিল। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয়তাবা কেমন চেহারা নেবে, সে বিষয়ে প্রথম দিকের কংগ্রেস নেতাদের কোন স্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়নি, তাঁদের সামনে কোন পূর্ব নির্দিষ্ট আদর্শ বা দৃষ্টান্তও ছিল না। ঔপনিবেশিকতাকে মুখ্য প্রতিপক্ষ মনে করে এবং নিজেদের সেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একজোট হওয়া একটি জাতি, এই সংজ্ঞা তৈরী করা আবশ্যকীয় ছিল। ব্রিটেনের শাসন কি ভারতের মঙ্গলের জন্যই? ইংরেজ শাসকপক্ষ এবং ভারতীয় প্রজাবর্গের স্বার্থ কি এক? না কি এর মধ্যে কোন বিরোধ থাকছে?

বিরোধ কি শুধু ভারতের ইংরেজ শাসকেরদের সঙ্গে না কি ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে, কিংবা বৃহত্তর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটার সঙ্গে? ভারতীয়রা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে লড়াই এ পারবে? আর সেই লড়াই কি ভাবে হবে। এই সব নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই প্রথম দিকের নেতাদের কাজ ছিল। উত্তরের সন্ধানের মধ্যে ভুল ত্রুটি হয়েছিল। তবুও মনে রাখতে হবে কংগ্রেসের প্রথম নেতারা সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই সত্য হল জাতীয়তাবাদের স্বরূপ নির্ণয় করা। কোন গণআন্দোলন কংগ্রেসের নেতারা তৈরী করতে পারেননি। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শের লড়াই তারা শুরু করেন। একটি পথ তৈরী হয়, এবং সেই পথের যাত্রাও তাঁরা শুরু করে দেন।

সামাজিক/সাংস্কৃতিক পটভূমি ঃ

একদিকে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্রুত প্রসার অন্যদিকে ইংরেজ শাসকদের উন্নাসিক মনোভাব একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল। দেশীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার একটা সচেষ্ট প্রয়াস প্রায় গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া ও প্রভাবের বিরুদ্ধে দেশজ সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষার গুরুত্ব এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একটি সমান্তরাল ধারাও একই সঙ্গে কাজ করছিল। রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনগুলির অগ্রসরতার সঙ্গে দেশজ সংস্কৃতির আবেগ সঞ্চালিত আন্দোলনের কিন্তু তাল মেলেনি। ভারতীয় ধর্ম ও দেশজ সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য থেকে, বিদেশী শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বাইরে একটি সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব খুঁজে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টা অনেক সময় ভিন্নতা এবং রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করছিল। কিন্তু অন্যভাবে দেখলে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও দেশাচারকে আঁকড়ে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের ভূমিকাও তৈরী হচ্ছিল। ধর্মশাস্ত্রগুলির ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ, অথবা বর্ণাশ্রম প্রথার আদর্শগত ব্যাখ্যা ভারতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলির দিকে ফিরে তাকানো, কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, বীরত্বের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা, এই সবের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় একটি সাংস্কৃতিক ধারার অনুসরণ, পরবর্তী সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী করে দেয়।

অর্থনৈতিক পটভূমি ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নেতারা ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও সমালোচনাও তৈরী করে ছিলেন। প্রথম দিকে ভাবা হয়েছিল ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ যথার্থ আধুনিক হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে ভারতবর্ষীয় অর্থনীতিও উন্নত ও অগ্রসর হবে। মোহমুক্তি ঘটল ১৮৬০ এর পর থেকে। এই সময় থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের চেহারাটি প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগের দিনগুলিতে যে ভাবে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল তার পরিচয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অবতারণা হয়েছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য—একথা প্রাকমহাবিদ্রোহ সময়ের মানুষেরা সঠিক বুঝেছিলেন। হয়ত ঔপনিবেশিক শাসনের প্রক্রিয়াটি তারা সঠিক নির্ধারণ করতে পারেন নি, কিন্তু অনুভবে তা উপলব্ধ হয়েছিল। সেই অনুভূতি থেকে

মহাবিদ্রোহের সময়ে কৃষক, কারিগর তালুকদের জোট সম্ভব হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তখনও ব্রিটিশ শাসনের ঘোরে আচ্ছন্ন ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত। মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ঘোর কাটতে শুরু করে।

দাদাভাই নৌরজী প্রথম ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও রিক্ততার কথা বললেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বললেন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অবনতির কারণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল উদ্দেশ্য হল, ভারতীয় অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ দখলে রাখা, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে প্রমুখ নেতারা এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। বিদেশী পুঁজি ভারতীয় সম্পদের নির্গমন এবং অর্থনীতির অবক্ষয় ঘটিয়েছে, এ কথা বললেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ভারতীয় কারিগরি শিল্পের ধ্বংস এদের উদ্বিগ্ন করেছিল। রেলপথের সম্প্রসারণ, তারা ঔপনিবেশিক দখলের সম্প্রসারণ বলে মনে করলেন। ভারতবর্ষের সম্পদের হস্তান্তর এবং নির্গমন এদের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। নির্গমন তত্ত্বের প্রধান বক্তা ছিলেন দাদাভাই নৌরোজি। ব্রিটিশ চেম্বার অফ কমার্সই ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজনীতি নির্ধারণ করছে, বললেন সচ্চিদানন্দ সিনহা।

অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সর্বাঙ্গীন চেহারাটি পরিষ্কার করে তুলে ধরে, এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক কারণ হিসেবে ঔপনিবেশিকতাকে দায়ী করেছিলেন, কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতারা। জাতীয় সচেতনতার ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান এবং সিদ্ধান্তের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালের সংগ্রামী জাতীয়তা বাদের মূলে বড় কারণ ছিল ইংরেজ শাসকদের যথেচ্ছাচার। অর্থনৈতিক যথেচ্ছাচারের চেহারাটা তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন, কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নেতারা।

৪.২.২ সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা

জাতীয় চেতনার প্রকাশের মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং জাতীয়তা বোধ প্রচারের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রের বড় ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের কার্য বিবরণী, প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্তগুলিও প্রকাশিত হত সংবাদপত্রে। এইভাবে সংবাদপত্র, কংগ্রেসের কার্যাবলী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিত। তাছাড়া নির্ভীক সাংবাদিকতা ও জোরালো বক্তব্যের জন্য বেশ কিছু সংবাদপত্রের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। পি. সুব্রহ্মণ্য আয়ারের পরিচালনায় হিন্দু, বালগঙ্গাধর তিলকের, 'কেশরী' এবং 'মারাঠা' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলি', শিশির কুমার ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পঞ্জাব থেকে প্রকাশিত 'আখবরি আম', বোম্বাইতে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ', বাংলার 'সোমপ্রকাশ' ইত্যাদি কাগজগুলির সঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা কোন না কোন ভাবে যুক্ত থাকতেন। তাদের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটত এই খবরের কাগজগুলির পাতায়। সংবাদপত্রগুলির আরও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, শহরে প্রকাশিত হয়ে এগুলি পৌঁছে যেত গ্রামাঞ্চলে। এভাবে শহরের মানুষ এবং গ্রামের মানুষ, একই রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণে একই সঙ্গে আন্দোলিত হতেন। যাবতীয় রাজনৈতিক আলোড়ন ও বিতর্কগুলি

খবরের কাগজের পাতাতেই হত। শুধু ভারতীয় ভাষাতেই নয়, ইংরেজী ভাষাতেও খবরের কাগজগুলি কখনও সোজাসুজি, আবার কখনও তীর্যকভাবে ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করত, সরকারী নীতির সমালোচনাও করত।

এইভাবে সংবাদপত্রগুলি রাজনৈতিক সামগ্রিকতা তৈরী করেছিল। তাছাড়া রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন, এবং মতবাদের পরিবর্তনও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের মতাধর্স প্রথম দফায় বিশেষ কিছু খবরের কাগজের লেখালেখিতেই ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়।

১৮৮১ সালে বালগঙ্গাধর তিলক দুটি কাগজ বার করেন। মারাঠা প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে, কেশরী মারাঠি ভাষায়। ১৮৯৩ সালে তিলক, গণপতি উৎসব এবং ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসব শুরু করলেন। মারাঠি সংস্কৃতি, আচরণীয়, ধর্ম ও ঐতিহ্যের মূলে ফিরে গিয়ে তারই ভিত্তিতে জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলাই তিলকের উদ্দেশ্য ছিল। শিবাজীকে মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর হিসাবে পরিচিত করে মারাঠা বীর হিসেবে পরিচিত করা, মারাঠা ইতিহাসের অতীত গৌরব ও মহিমা প্রচার করা এবং তরুণ মারাঠীদের উদ্বুদ্ধ করাও তিলকের লক্ষ্য চিল। এভাবে স্বদেশের মাটিতে স্বদেশের অতীত থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাদেশিকতার ভাবনা তৈরী করেছিলেন তিলক। একই সঙ্গে কৃষক, কারিগর, শ্রমিকদের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার অন্তর্গত করার কথা তিলকই সর্বপ্রথম ভেবেছিলেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে পুনাতে সার্বজনিক সভার তরুণ সদস্যদের নিয়ে তিলক No tax আন্দোলন সুরু করলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত মহারাষ্ট্রের কৃষকদের তিলক বললেন অজন্মার সময় তারা যেন কোনমতেই কর না দেয়। ১৮৯৭ সালে পুনাতে প্লেগ মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে তিনি প্লেগ নিরোধের কাজে যুক্ত হন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের প্রতি সহানুভূতিহীন, হৃদয়হীন নির্বিকার মনোভাব ও ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনাও তিনি করেছিলেন। প্লেগরোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, সেই উপলক্ষ্যে সরকারের ব্যবস্তাকে কার্যকরী করার জন্য যে সব সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের উন্নাসিক ব্যবহারে এবং অমানবিক আচরণে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ক্রমশই বাড়তেই থাকে। ১৮৯৮ সালের ২৭শে জুন পুনা প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান র‍্যান্ড (Rand) এবং লেফটেনান্ট আর্মাস্টকে হত্যা করলেন চাপেকর, দুই ভাই। আর্য়াস্ট এবং র‍্যান্ডের হত্যাকান্ড, সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হল। চাপেকর ভাইদের এই কাজকে আমরা বৈপ্লবিক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সূচনা বলে মনে করতে পারি।

৪.২.৩ সংগ্রামী জাতিয়তাবাদ এবং সশস্ত্র বিপ্লব

সংগঠন ও প্রতিবাদ আন্দোলন ঃ

১৮৯৪ থেকেই মহারাষ্ট্রে, সরকারের মুদ্রা tariff এবং দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত নীতিগুলি এবং তার বিলিব্যবস্থা সাধারণ মানুষের ভালো লাগেনি। জাতীয় নেতাদের একাংশের মধ্যে প্রতিবাদী এবং লড়াইয়ের মনোভাব

স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সংবাদপত্রের কলমে, ইংরেজ সরকারের সমালোচনা তীব্রতর হচ্ছিল। এরই মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক সর্বজনপ্রিয় নেতা হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন, তেমনি ইংরেজ সরকারের সন্দেহও তার সম্বন্ধে বেড়ে যাচ্ছিল। র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টের হত্যাকান্ড একটি ষড়যন্ত্র মনে করে এবং চাপেকর ভাইদের সঙেঘগ তিলকের যোগাযোগ রয়েছে কিনা, তার অনুসন্ধান শুরু হল। 'কেশরী' পত্রিকায় তিলক তার সরকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধ করেন নি। কেশরী পত্রিকায় শিবাজীর উক্তি নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে বর্ণিত শিবাজীর আফজল খানের হত্যার সমর্থনের মধ্যে ইংরেজ সরকার, ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের হত্যার উসকানির ছায়া দেখল। ফলে বোম্বে লেজিস লেটিভ কাউনসিলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিলকের ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

ভারতবর্ষে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লবী রাজনীতির সূত্রপাত, বালগঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং কারাদণ্ডের ঘটনার মধ্যে দিয়ে হয়েছিল একথা বলা যেতে পারে। যদিও সশস্ত্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ পরিণত রূপে শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাজন এবং নরমপন্থা ও চরমপন্থা এই দুই শিবিরে কংগ্রেসের ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে।

চরমপন্থী নেতাদের চিন্তাভাবনার এবং অনুভবের তীব্রতা থেকেই কিন্তু সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জন্ম। চরমপন্থী নেতাদের তরুণতর যারা, তাঁরাই ক্রমশঃ অস্ত্রের শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের লড়াইতে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন।

সংগঠন ঃ

ঊনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকেই বিপ্লবী চিন্তার সূচনা হয়। এই সময় বাংলা এবং মহারাষ্ট্রে বেশ কতগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। ১৮৭৬ সালে রাজনারায়ণ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সঞ্জীবনী' সভা তৈরী করেন। ১৮৭৭ সালে তৈরী হয় কলকাতার হিন্দুস্তান ইউনিয়ন। ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে 'ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী' গঠন করলেন। এই সমিতির বক্তব্য ছিল স্বরাজ শাসনই একমাত্র বিধাতা নির্দিষ্ট শাসন। ১৮৭২ সালে, মহারাষ্ট্রে প্রথম গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে। এই সমিতিতে মারাঠা তরুণদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ নেওয়া হল। ১৮৯৫ সালে দামোদর চাপেকর এবং বালকৃষ্ণ চাপেকর এমন একটি সংগঠন তৈরী করলেন যেখানে তরুণদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্টের হত্যা পরিকল্পনার জন্য এই দুই চাপেকর ভাই এর ফাঁসি হয়। সম্ভবত চাপেকর ভাই রাই মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে প্রথম অস্ত্রের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটালেন। সশস্ত্র জাতীয়তাবোধের ধারণাকে তারাই প্রথম রূপ দিয়েছিলেন।

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ ঘোষ নামে এক যুবক ইংল্যান্ডে পড়াশুনো শেষ করে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং বরোদায় কাজে যোগ দেন। অরবিন্দ প্রথম থেকেই কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতাদের রাজনীতি এবং কর্মপন্থার বিরোধী ছিলেন। অরবিন্দও গুপ্তসমিতি তৈরী করেছিলেন। মহারাষ্ট্রে, পুনাতে ঠাকুর সাহেবের

গুপ্তসমিতি ওয়ার্ধায় 'বালসমাজ' এবং আর্যবান্ধব সমাজ', এছাড়া নাগপুর, বোম্বাই, বরোদা, লাহোর, হায়দ্রাবাদ এ সমস্ত জায়গাতে সর্বত্র গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। সশস্ত্র সংগ্রামী আন্দোলনের Blue Print এই গুপ্তসমিতিগুলিতে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাতেও নানা বিপ্লবী সংগঠন তৈরী হয়েছিল। ১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ও সতীশচন্দ্র বসু। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি তৈরী করলেন পুলিন বিহারী দাস। যুগান্তর দল তৈরী হল ১৯০৬ সালে। রবীন্দ্রনাথের ভাগনি সরলাদেবী এবং বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতাও এই সময়ের বাংলার বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত হন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরে থেকে নিবেদিতা রাজনৈতিক জগতে সক্রিয় অংশ নেন। নিবেদিতা সম্ভবত রাশিয়ান অনার্কিষ্ট (Anarchist) নেতা পিটার ক্রোপটকিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দর দেখা হয় বরোদায়। অরবিন্দকে তিনি কলকাতার গুপ্তসমিতিগুলির খবর দেন। এছাড়া বাংলার গুপ্তসমিতিতে দুষ্প্রাপ্য ম্যাৎসিনির (Matzzim) আত্মজীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লব প্রচেষ্টায় উদ্যোক্তাদের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নিবেদিতার প্রচার কার্য সম্বন্ধে বলেছিলেন ম্যাৎসিনির আত্মজীবনীর ছয় খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি তিনি বৈপ্লবিক সমিতিকে প্রদান করেন.....এই পুস্তকের শেষে, গেরিলা যুদ্ধ কি প্রকারে করিতে হয় তৎ বিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। ইহা টাইপ করিয়া চারিদিকে প্রেরিত হইত,.....এই যুদ্ধ পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল।" (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পৃ ১৪৯)।

জাপানি অধ্যাপক ওকাকুরা কিছুদিন বেলুড় মঠে বসবাস করেছিলেন। তার আইডিয়াল অফ দি ইস্ট (Ideal of the East) গ্রন্থে, ইওরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদের পদানত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তির কথা বলা হয়। ওকাকুরা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিবেদিতা এবং হেমচন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে একটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী তরুণদের মনে বিপ্লবী চিন্তা ও চেতনা জাগিয়ে তোলা।

সরলাদেবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হন, এবং বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন।

সাহিত্য, দর্শন, সমকালীন লেখক ও চিন্তাবিদদের প্রভাব ঃ

ঊনিশশতকের বেশ কিছু চিন্তাবিদ এবং লেখক বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব ছিল সব চাইতে বেশী। তাঁর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস বিপ্লবীদের স্বাধীন বাংলা এবং শক্তিমান বাঙালীর আদর্শ স্থাপন করেছিল এবং বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ করে আনন্দমঠ উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম' গানটি বিপ্লবীদের স্বদেশী সঙ্গীতের রূপ নেয়। 'বন্দে মাতরম' বিপ্লবীদের সংগ্রামী স্লোগানে পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ভাবনায় স্বদেশ,

বৃহ ভারতের ত্তর আকার নেয়নি। স্বদেশ বলতে তিনি বাংলা বুঝেছিলেন। কিন্তু আনন্দমঠ উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী উপস্থাপন করে, আঠারো শতকের ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে সংগ্রামী বিপ্লবীদের সামনে ঐতিহাসিক আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুর্নীতি এবং অপশাসনের প্রত্যক্ষ ফলাফল 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' (১৭৭০) ভয়াবহ বিবরণ বিপ্লবীদের কাছে ঔপনিবেশিক শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের দিকটিও তুলে ধরেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন। ১৯০১ সালে বিবেকানন্দ ঢাকা শহরে যান। সেখানে পরবর্তীকালের বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ ও তার সহকর্মীরা তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। বিবেকানন্দ তাদের একটি কর্মীদল গঠন করতে বলেছিলেন। বিবেকানন্দ প্রাথমিক ভাবে হিন্দুভারতের ঐক্যসাধন এবং হিন্দুধর্মের প্রচারক হলেও কোন এক সময় সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও চিন্তা করেছিলেন। বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তুত করিব.....কিন্তু ভারত পালিত হইয়াছে। এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষাদান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবেন (সুপ্রকাশ রায় পৃঃ ১৩১)।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের শক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ছিলেন তিনি। বিপ্লব সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও বিবেকানন্দ বার বার, সাহস এবং শক্তি ধ্বংসের দেবতা কালীর উপাসনার কথা বলে বিপ্লবীদের অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই এ উজ্জীবিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ জন্মভূমিকে কালী এবং দূর্গা এই দুই মাতৃশক্তির সঙ্গে অভিন্ন করে দেন। কালী বা দূর্গা তাই প্রথম যুগের সংগ্রামী বিপ্লবীদের আরাধ্য দেবতা হয়েছিলেন। যেমন গণেশ দেবতাকে তিলক বিপ্লবীদের জাতীয় দেবতা বলে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে। এই সময়কার অর্থাৎ প্রথম পর্বের সংগ্রামী বিপ্লব ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুত্বের আবরণে আচ্ছাদিত এবং সে কারণে সীমাবদ্ধ। ১৯০৫ সালে অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানীমন্দির' প্রকাশিত হয়। দেবী ভবানী একাধারে দূর্গা এবং কালী আবার দেশমাতার প্রতীক। ভবানীদেবীর মন্দির বিপ্লবীদের গোপন সংগঠনের প্রতীক।

এভাবে প্রথম পর্বের সংগ্রামী বিপ্লবীরা জাতীয়তা থেকে ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একীকরণ করেছিলেন।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ধারাটি কিন্তু কোন ঘটনা পরম্পরায় গড়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পশ্চিমী উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব এবং ইউরোপীয় বিপ্লবগুলির প্রভাবে যে মূল ধারার জাতীয়তা বাদ উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, এবং যার প্রকাশ ছিল বৈধতা ও নৈতিকতার দাবী ভিত্তিক সংসদীয় প্রথার বক্তৃতা, প্রতিবাদ মিটিং এবং আবেদনের রাজনীতিতে, তারই পাশাপাশি অন্তঃস্রোতের মত সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ধারাটিও বইছিল। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রেরণা ছিল ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। প্রতাপ সিং, শিবাজী, এমনকি বাংলার বারোভুঁইএগাদের অন্যান্য প্রতাপাদিত্যের মত

মধ্যযুগীয় চরিত্ররা। প্রাক মহাবিদ্রোহ সময়ের, সাওতাল কোল মুন্ডা, ওয়াহাবি ইত্যাদি একাধিক অভ্যুত্থানগুলি সশস্ত্র সংগ্রামের পটভূমি এবং অনিবার্য দিক নির্দেশ করেছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সশস্ত্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় বলে মনে করা যেতে পারে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহেকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। বিপ্লবী ভাবনা চিন্তা এবং সশস্ত্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ধারাটি অতএব সমান্তরালভাবে পাশাপাশি কাজ করছিল। রণকৌশলও তৈরী হয়েছিল পাশাপাশি।

রাশিয়া এবং জাপান যুদ্ধে জাপানের জয় বিপ্লবীদের প্রবল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় (১৯০৫) একটি প্রবল প্রতাপ ইউরোপীয় শক্তিকে এশিয়ার কোন দেশ পরাজিত করতে পারল, এই ঘটনা বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করল। এর অল্পপরেই রাশিয়ার প্রথম বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসানও বিপ্লবীদের উৎসাহিত করে। অত্যাচারী শাসককে রণক্ষেত্রে পরাজিত করা সম্ভব, এই বাস্তব ঘটনা, ভারতীয় বিপ্লবীদের চেতনাকে উজ্জীবিত করল।

৪.২.৪ প্রথম পর্ব

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছিল উনিশশতকের শেষের দিকে। বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও তাঁর দাদা গণেশ দামোদর সাভারকর ১৮৯৯ সালে 'মিত্রমেলা' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। ১৯০৪ সালে ইটালির ঐক্য আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মাৎসিনির 'ইয়ং ইটালির' (Young Italy) অনুকরণে সাভারকর ভাইরা অভিনব নব্যভারত সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। বিনায়ক সাভারকর শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বৃত্তি পেয়ে ইংল্যান্ড চলে যান। ১৯০৫ সালে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ছটি বৃত্তি ঘোষণা করেছিলেন। এই বৃত্তির উদ্দেশ্য ছিল, তরুণ ভারতীয়দের বিদেশে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করা। বিনায়ক সাভারকর ইংল্যান্ডে চলে গেলেও, গণেশ সাভারকর বোম্বাই এবং পুনায় প্রতিটি কলেজে অভিনব সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। মাৎসিনির আত্মজীবনী মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করে বিলি করারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম যুগের অন্যতম নায়ক ও প্রচারক হলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে। ফাড়কে বিভিন্ন অনুন্নত উপজাতির মানুষদের নিয়ে একটি সক্রিয় বাহিনী তৈরী করেছিলেন। ডাক ও রেল চলাচল বিপর্যস্ত করা, জেলখানা ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করা, শাসকদলের মনে সন্ত্রম সৃষ্টি করা এবং সরকারী তোষাখানা লুট করা, এই সব তার পরিকল্পনা ও লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বাসুদেব বলবন্তের প্রয়াস সফল হয়নি। তার পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায় এবং পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে ফাড়কের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। জেলের ভেতরেই ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ফাড়কের মৃত্যু হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বৈধ নীতির সমর্থক কংগ্রেসের প্রথম দিকের নেতাদের জনপ্রিয়তা যেন ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলক এবং তারই মতের নেতারা ব্রিটিশ সরকারের নীতি

ও কার্যকলাপের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কংগ্রেসের এ যাবৎ ঐক্যে ফাটল ধরছে দেখা গেল। তিলক এবং তার সমর্থকরা চরমপন্থী বলে পরিচিত হচ্ছিলেন। উত্তরোত্তর বিরোধের ফলে কংগ্রেসের দুই শিবিরে ভেঙ্গে যাওয়া ঘটল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-এর পর। কিন্তু তার আগেই নরমপন্থী এবং চরমপন্থী এই দুই দলের মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৯শে জুলাই ১৯০৫ গভর্নর জেনারেল কার্জন বাংলা বিভাজনের কথা ঘোষণা করলেন। আসাম এবং পূর্ববঙ্গ নিয়ে একটি প্রদেশ, এবং বাকি বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার অংশ নিয়ে দ্বিতীয় প্রদেশ— কার্জনের বঙ্গভঙ্গের এই প্রস্তাব বলাবাহুল্য প্রতিবাদের প্রবল আলোড়ন তুলল। কার্জন অবশ্য বলেছিলেন যে বাংলা একটি বৃহৎ প্রদেশ, এবং একক কোন শাসন ব্যবস্থার পক্ষে বাংলা শাসন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ শুধু মাত্র শাসন কার্যের সুবিধার জন্য এই বিভাজন প্রয়োজন। কিন্তু স্বদেশী বুদ্ধিজীবীদের কাছে কার্জনের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝেছিলেন বাঙালী জনগণকে বিভক্ত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করাই ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য। এছাড়া এযাবৎ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি নষ্ট করে ঐক্যকে ভেঙ্গে দেওয়ার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। উচ্চবংশীয় আশরফ 'সম্ভ্রান্ত' মুসলিমদের তুষ্ট করা ইংরেজ সরকারের নতুন নীতি ছিল। সমগ্র পূর্ববঙ্গ ঘুরে কার্জন এই মর্মে বক্তৃতা দিলে, যে প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশটিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে, সরকারপক্ষের অবহেলাজনিত যে ক্ষোভ জমে ছিল, তার অবসান ঘটানোই ইংরেজ সরকারের নতুন নীতির লক্ষ্য হবে। ঢাকা শহরের লুপ্ত গৌরবকে নতুন করে উজ্জীবিত করার কথাও কার্জন বলেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সরকারীভাবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব গণআন্দোলন শুরু হয় এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে যায়। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতা শহরের একটি বিশাল জনসভায় জাতীয় নেতারা ব্রিটিশ পণ্য বয়কট বা বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হয়। সেদিনটি জাতীয় শোকদিবস হিসেবে পালিত হল। বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে ভারতীয় স্বাধীনতার যথার্থ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলনের প্রধান দুটি কার্যসূচী ছিল, বিদেশী পণ্য বর্জন, এবং স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার— বয়কট এবং স্বদেশী।

বয়কট এবং স্বদেশী উপলক্ষ করে কংগ্রেসী নেতাদের মতবিরোধ দেখা দিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনকে বিদেশী পণ্য বর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। অন্যদিকে গোখলের নেতৃত্বে অন্য নরমপন্থীরা প্রাথমিকভাবে বয়কট এবং স্বদেশীকে বাংলার ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক বিপিনচন্দ্র পাল নতুন সংগ্রামী নেতারা শুধু যে এটিকে সর্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে চাইলেন তাই নয়, বয়কট বা বর্জনের ক্ষেত্রসীমা প্রসারিত করে শুধুমাত্র বিদেশী পণ্য নয় বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চাইলেন। তিলক এতদিনে তিনি লোকমান্য নামে খ্যাত হয়েছেন, পুনা, বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের অন্যত্র স্বদেশী ও বয়কটের কথা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লালা

লাজপৎ রায় এবং অজিত সিং পাঞ্জাবের সর্বত্র স্বদেশীর বার্তা পৌঁছে দেন। সৈয়দ হায়দর রাজা দিল্লী আন্দোলনের নেতৃত্বে দেন। রাওয়ালপিন্ডি, কাংড়া, জম্মু, মুলতান এব হরিদ্বার সর্বত্র স্বদেশী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। চিদাম্বরণ পিল্লাই মাদ্রাজ এবং তামিলনাড়ু অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা মাদ্রাজ স্বদেশী চিন্তাকে জোরদার করেছিল।

বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনও তীব্র হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী আবেগ অন্তঃপুরের মেয়েদেরও স্পর্শ করেছিল। প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেসের বরিশাল অধিবেশনে আবদুল রসুল সমস্ত ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে 'যা পঞ্চাশ বা একশো বছরেও হয়তো ঘটত না, তা ছ মাসেই ঘটে গেল।' স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বও যেমন তৈরী হল, তেমনি তার গতিও দ্রুত হল। স্বদেশী শব্দের অর্থ নতুন এবং গভীর তাৎপর্য নিল। স্বদেশী গান, কবিতা, আগেও লেখা হয়েছে, এখন তা গভীরতর অর্থে ব্যাপকতর মাত্রায়, চেতনায় অনুভূত হল। রবীন্দ্রনাথ তার এই সময়কার লেখাপত্রে, গানে, কবিতায় স্বদেশী শব্দটিকে অনুভূতিময় করে তুললেন। সরলাদেবী, নিবেদিতা এরা প্রত্যেকেও স্বদেশী ভাবনা এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। আরেকটি গ্রন্থ এই সময়ে বিশেষভাবে স্বদেশী চেতনা এবং আত্মশতির কথা বলেছিল, তা হল সখারাম গণেশ দেওস্করের 'দেশের কথা।' এই বইটিতে স্পষ্ট করে বলা হল, আত্মিক ও আর্থিক আত্মপ্রতিষ্ঠা স্বদেশী চেতনার বড় দিক। অতএব স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী সংস্কৃতি ও জাতীয় শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হোক—একথাই বললেন সখারাম গণেশ দেওস্কর।

সখারাম গণেশ দেওস্কর প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি স্বাধীনতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এই শব্দটিকে মেঘগর্জনের মত জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রকম্পিত করলেন বালগঙ্গাধর তিলক। স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার—তিলকের এই ঘোষণা জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রই পালটে দিল। অরবিন্দ ঘোষ বন্দেমাতরম পত্রিকায় স্বরাজ অর্জনের আকাঙ্খাকে স্পষ্টতর করে তোলেন। দাদাভাই নৌরজি বললেন স্বরাজ হল ব্রিটিশ শাসন মুক্ত আত্মকর্তৃত্ব।

স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ ছাত্র সমাজ। ইংরেজ সরকারের দমননীতির উৎপীড়ন পুরোটাই তাদের ওপর পড়েছিল। ১৯০৫ সালে আর ডব্লিউ, কার্লাইল (R.W. Carlyle) সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সার্কুলার পাঠান এই মর্মে যে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হয়। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করবার জন্য ডন (Dawn) সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বসু এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি (Anti Circular Society) তৈরী করলেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) স্থাপিত হল। এই সঙ্গে ন্যাশনাল কলেজ তৈরী করেছিল। এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দিতে বরোদা থেকে বাংলায় এলেন অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষের 'কর্মযোগী', 'বন্দেমাতরম', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর 'যুগান্তর' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এই সমস্ত সমকালীন পত্রিকা গুলি স্বদেশী চেতনার তীব্রতর করেছিল। অন্যদিকে 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' বিপ্লবী চেতনায় মারাঠি তরুণদের জাগিয়ে তুলল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী এবং বয়কট সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ভাবনা এবং পরিকল্পনাকে স্পষ্ট করে তুলেছিল, বঙ্গভঙ্গের ফলে যে রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরী হয়েছিল, সেই উত্তাপ সংহত হয়ে বিস্ফোরণের মত সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত হল।

১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে স্বদেশী আন্দোলনের গতি এবং চরিত্র কেমন হবে এই প্রবল বিতর্কের মধ্যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীরা ভাগ হয়ে গেলেন। চরমপন্থীদের রাজনীতির মধ্য থেকেই সংগ্রামী সশস্ত্র জাতীয়তাবাদ শুরু হয়েছিল। এবং তার প্রথম সূচনা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। তিলকের 'গণপতি উৎসব' বা 'শিবাজী উৎসব' মারাঠি তরুণদের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী শুধু করে নি, পাশ্চাত্যের দিকে না তাকিয়ে, ভারতের অভ্যন্তরে জাতীয় ইতিহাসের দিকে নির্দেশিত করেছিল। প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী চাপেকর ভাইরা, দামোদর এবং বালকৃষ্ণ, অত্যাচারী ইংরেজ র‍্যাণ্ড (Rand) এবং আর্য়াস্ট (Eyrst) কে হত্যা করলেন। বিপ্লবী রাজনীতির সূত্রপাত সেখান থেকে। ফাড়কে, চাপেকর দুই ভাই এবং সাভারকর দুই ভাই বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। বিশশতকের গোড়ার দিকে (১৯০৭) গণেশ সাভারকর গ্রেপ্তার হন ও তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ২১শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হলেন বিপ্লবীদের হাতে। ১৯১০-১১ সালে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। বিচারে অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে, বিনায়ক নারায়ণ দেশ পাণ্ডে এবং কৃষ্ণগোপাল কার্বের ফাঁসি হল। দামোদর বিনায়ক সাভারকরকেও ইংল্যান্ড থেকে বন্দী করে আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠানো হল।

একই সময়ে বাংলায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ গোপনে তরুণ বিপ্লবীদের সংগঠিত করছিলেন। ১৯০২ সালের অনুশীলন সমিতি এবং ১৯০৬ সালের যুগান্তর গোষ্ঠী তরুণদের বিপ্লবী ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্রচালনায় শিক্ষিত করতে থাকে। অরবিন্দর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা কাগজের লেখাগুলি তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। গুপ্ত সংগঠন গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হল অত্যাচারী ইংরেজকে নির্দ্দিষ্ট করে, অতর্কিতভাবে তাকে হত্যা করে শাসকগোষ্ঠীর মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, এবং সেইভাবে ব্রিটিশ শাসনের ওপর চাপ তৈরী করা।

প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের একটি প্রধান ত্রুটি থেকে গিয়েছিল ইংরেজ সরকারের নিরন্তর বিরোধিতা এই কর্মপন্থা তারা চরমপন্থীদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তিলক ছিলেন এ ব্যাপারে শিক্ষাগুরু। কিন্তু একটি আন্দোলন কেমন হবে, তা নিয়ে সঠিক ভাবনা চিন্তা হয়নি। একটি সংগঠিত সশস্ত্র গণআন্দোলন শুরু করা দুরূহ কাজ; সময় সাপেক্ষ তো বটেই। এর জন্য দরকার তৃণমূল পর্যায় থেকে সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক আদর্শে শিক্ষিত করা। এঁদের মধ্যে অনেকে গোপনে, এবং তলে তলে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে বিপ্লবের সংগঠন কে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন, যেমন হয়েছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময়। কিন্তু এও কঠিন কাজ ছিল। তবু ঠিক হল গণ আন্দোলন এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া— এই দুই উদ্দেশ্যই ভবিষ্যতের কর্মসূচী হবে। আপাতত সশস্ত্র বিপ্লবীরা আইরিশ জাতীয়তাবাদী এবং রাশিয়ান

নিহিলিস্টদের মত শাসকগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরাস্ত করতে চাইলেন। সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য হল অত্যাচারী, পীড়নকারী ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হত্যা করা। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে শাসকের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে ভয়, তা দূর করা এবং ভারতীয়দের সাহস শক্তি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। হত্যাকারী বিপ্লবী ধরা পড়লে, তার বিচারকার্যকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রচার কার্যসূচী বলে মনে করা হবে ঠিক করা হল। প্রয়োজন ছিল মৃত্যুভয়হীন সাহসী এবং দেশপ্রেমিক তরুণ দল। খুব স্বাভাবিক ভাবে তৎকালীন সময়ের উত্তপ্ত আবহাওয়ার ভারতীয় তরুণদের বড় অংশ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হল, এবং বিপ্লবী দলে যোগ দিল। বীরত্বের স্বপ্ন ও উদ্দীপনাও তাদের উৎসাহিত করেছিল।

১৯০৫ সালের পর থেকেই বেশ কিছু পত্রপত্রিকা সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের পরিকল্পনাকে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল। ফলে পরিবেশও তৈরী ছিল, এর আগে চাপেকর ভাইদের কথা এবং সাভারকর ভাইদের কথা, বাংলায় এসে পৌঁছেছে। ১৯০৭ সালে তৎকালীন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণরকে হত্যা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে মজফফরপুরে পীড়নকারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি গাড়ীর ওপর বোমা ছোঁড়া হয়। কিন্তু সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। ছিলেন দুজন ইংরেজ মহিলা, যারা মারা গেলেন। বোমা ছুঁড়ে ছিলেন নিতান্ত তরুণ দুই ছেলে। এদের মধ্যে প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন। অন্যজন ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরামের বয়স ছিল মাত্র ষোল। ষোল বছরের বালকের এই সাহস, বীরত্ব, আত্মত্যাগ দেশবাসীকে উদ্বেলিত করল। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়েছিল। প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিত হলেন। এমন কি তাদের নিয়ে বিশেষ করে ক্ষুদিরামকে নিয়ে লোকসংগীত রচনা হয়েছিল এবং সারা দেশে এই লোকসংগীতের মাধ্যমে ক্ষুদিরামকে ঘিরে কিংবদন্তী তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এভাবে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যের একটি অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে নির্বিকার উদাসীন্য থেকে উজ্জীবিত করে দেশপ্রেমে এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীতে সচেতন করার উদ্দেশ্য সফল হল।

বিশ শতকের প্রথম দুই শতকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগঠনগুলির কার্যধারা ছিল এই রকম— একদিকে নিপীড়ক ইংরেজ বা দেশীয় সরকারি কর্মচারীদের হত্যা, একই সঙ্গে দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক বা খবর পাচারকারীদের নির্মূল করা; অন্যদিকে ডাকাতি করে অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয় কাজটি লোকমুখে, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বদেশী ডাকাতি হিসেবে পরিচিত হল।

১৯০৭-১৯০৮ সাল— এই বছরটাই ছিল স্বদেশী ডাকাতি এবং বিদেশী শাসকদের হত্যার মাধ্যমে বিপ্লবী তৎপরতার সময় সাল। পুর্ববঙ্গের গভর্নর র‍্যামফিল্ড ফুলার (Ramfield Fuller) এবং বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে (Andrew Fraser) হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯০৪ সালে কলকাতার মানিকতলায় মুরারিপুকুর অঞ্চলে এক বাগানবাড়ীতে একটি ধর্ম বিদ্যালয়ের আড়ালে বোমা তৈরীর কারখানা শুরু করেছিলেন অরবিন্দের ছোটভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন উপেন্দ্রনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বোমার তৈরীর দায়িত্ব পড়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের ছাত্র উল্লাসকর দত্তের হাতে।

ইউরোপ থেকে বোমা তৈরীর কৌশল শিখে এসেছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগো। ১১ই আগস্ট ১৯০৮ সালে মানকিতালর বাড়ী তল্লাসি করে পুলিশ, অরবিন্দ সহ ছত্রিশজনকে গ্রেপ্তার করে। কলকাতার আলিপুর কোর্টে এদের বিচারের মামলা শুরু হল। আলিপুর বোমার মামলা বা মানিকতলা বোমার মামলা চলাকালীন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী বিপ্লবীদের হাতে মারা গেলেন। মামলা চলাকালীন জেলের ভেতর রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করলেন কানাইলালা দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসু। দুঃসাহসিক কাজ, খবর হয়ে বেরোনো মাত্র সাধারণ মানুনষ তাদের বিজয়ী বীর বলে অভিনন্দিত করল। কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেরন বসুর ফাঁসি হয়। আলিপুর বোমার মামলায় বিপ্লবীদের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জন দাশের সওয়ালের ফলে অরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হলেও উল্লাসকর, বারীন্দ্র এবং আরো তেরোজন বিপ্লবীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। অরবিন্দ কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। উত্তরপাড়া, চন্দননগর হয়ে শেষপর্যন্ত তিনি পণ্ডিচেরী চলে গেলেন। চন্দননগর এবং পণ্ডিচেরী দুইই ফরাসী উপনিবেশ ছিল। ইংরেজ বিরোধী ফরাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তার ছিল কিনা জানা যায় না। শেষপর্যন্ত তিনি রাজনীতির জগৎ এবং কর্মক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ দূরে চলে গিয়েছিলেন।

একই সময়ে পাঞ্জাবে কতগুলি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। গুপ্তসমিতিগুলি গড়ে তোলার পেছনে যার সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তিনি একজন প্রবাসী বাঙালী জে.এম. চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৬ সালে অরবিন্দের শিষ্য যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবী প্রচার কার্যের জন্য পাঞ্জাবে এসেছিলেন। পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন অজিত সিং এবং অম্বাপ্রসাদ। চরমপন্থী নেতা লাজপত রায় এদের সমর্থন করেছিলেন। মহাবিদ্রোহের পঞ্চাশ বছর পূর্তির বছর হিসেবে ১৯০৭-১৯০৮ সাল বিপ্লবীদের কাছে গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য তৈরী করে ছিল। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বিপ্লবীদের আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা হল।

অজিত সিং এর ভাই পরমানন্দ এবং হরদয়ালও এই সময়ে বিপ্লবী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯১২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্চকে (Lord Hardinge) হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হার্ডিঞ্জ আহন হন কিন্তু মারা যাননি। ভাইরসরয়ের ওপর এই আক্রমণ দেশ ব্যাপী চাঞ্চল্য তৈরী করে। বোমানিক্ষেপকারী কিন্তু ধরা পড়েনি। দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল লাহোরের লরেন্সগার্ডেনের ইংরেজ অফিসারদের হত্যার প্রচেষ্টা। লাহোরের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন বসন্ত বিশ্বাস, দীননাথ, অবোধ বিহারী বালমুকুন্দ এবং আমির চাঁদ। গুপ্ত সমিতির পরিচালক রাসবিহারী বসু। অন্যরা ধরা পড়লেও রাসবিহারী বসুকে ধরা যায় না। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামালায় বাকীরা অপরাধী সাব্যস্ত হন। এদের সকলেরই ফাঁসির হুকুম হয়।

১৯০৯-১৯১১ সালের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবেকে নানা ভাবে দমন করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন বন্ধ করা যায়নি। অরবিন্দ ঘোষের নিষ্ক্রিয়তা, নানা বিভ্রান্তি তৈরী করলেও তা কেটে যেতে সময় লাগে নি। ১৯১১ সাল থেকে নতুন করে বিপ্লবী তৎপরতা শুরু হয়। ১৯১৪ সালে যতীন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিদেশ থেকে বিশেষ করে ব্রিটেনের বিরোধী দেশগুলি থেকে অস্ত্রসংগ্রহ করার আয়োজন করেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে (পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বলে খ্যাত হন) বাটাভিয়া বা ইন্দোনেশিয়াতে পাঠানো হয়। প্রথমে ফাদার সি. আর মার্টিন (Father C.R. Martin) এবং পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে নরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত হন। ঠিক হল ম্যাভেরিক (Maverick) নামে একটি জার্মান জাহাজে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বাংলার সুন্দরবন, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও হাতিয়াতে বিদেশী অস্ত্র নামাবে। কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ আগেই খবর পেয়ে যাওয়ায় ম্যাভেরিক যাত্রা শুরু করতে পারেনি। ওদিকে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতলাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাশগুপ্ত এবং বাঘা যতীন উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর ধারে লুকিয়ে ছিলেন, এ খবর পুলিশ পেয়েছিল। কলকাতা থেকেই পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট (Charles Tegart) দলবল নিয়ে বালেশ্বর পৌঁছল। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, বুড়ীবালাম নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয়, তাকে যুদ্ধ না বললে, অংশগ্রহণ কারীদের সাহস, বীরত্ব এবং তেজকে যথার্থ সম্মান দেখানো হয় না। সাদাকাপড় উড়িয়ে অবসন্ন এবং ক্ষতবিক্ষত যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করার সংকেত দিলে পুলিশ গুলি চালানো বন্ধ করে। যতীন্দ্রনাথ এবং তার সহযোগীদের বীরত্বে স্বয়ং ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের সম্মান দেখিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে মারা যান। নীরেন দাশগুপ্ত এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্তর ফাঁসি হয়। জ্যোতিষের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কথিত আছে স্বয়ং টেগার্ট যতীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন বলেছিলেন, তিনিই একমাত্র বাঙালী, যিনি ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ৩৮৮)

বুড়ীবালামের ধারে বাঙালী সাহসী যুদ্ধে এবং যোদ্ধা বিপ্লবীদের মৃত্যু ও ফাঁসি, কিছুকালের মত বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন স্থগিত রাখল। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের কার্যক্ষেত্র এই সময়ে উত্তর প্রদেশের বাঁকি পুর, বেনারস এবং বিহারের পাটনা ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে ভারতের বাইরে শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, বিনায়ক সাভারকর ও হরদয়াল লণ্ডনে, এবং মাদাম কামা ও অজিত সিং ইউরোপে, ভারতীয়দের সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে আকৃষ্ট করার চেষ্টা বজায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামী বিপ্লবের ধারাকে সচল রাখলেন।

৪.২.৫ দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৯১৪-১৯১৯

পাঞ্জাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গর্ডনের হত্যার ষড়যন্ত্রের অন্যতম অভিযুক্ত রাসবিহারী বসু বেনারসে পালিয়ে এসেছিলেন। সেখানে ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে মারাঠি বিপ্লবী বিষ্ণু গণেশ পিংলের দেখা হল। কর্তার সিং নামে আরেক বিপ্লবীও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এক সর্বভারতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হল। কিন্তু পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার আগে পুলিশি তৎপরতায় বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় রাসবিহারী বসুকে এক

নম্বর আসামী সাব্যস্ত করা হয়, কিন্তু এবারও তাঁকে ধরা গেল না। লাহোর থেকে তিনি বাংলায় চলে এলেন। ১৯১৫ সালের ১২ই ছদ্মবেশে এবং পি.এন. ঠাকুর ছদ্মনামে, রাসবিহারী বসু জাপানে পালিয়ে গেলেন।

রাসবিহারী বসুর বাকী জীবন কাটে জাপানে। সেখান থেকে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্য অভিযুক্ত কর্তার সিং এবং গণেশ পিংলের ফাঁসি হয়।

দ্বিতীয় পর্বের সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে অনেকখানি প্রসারিত হয়েছিল। তাছাড়া এই সময়ের বিপ্লবী কার্যধারা ও আদর্শের ব্যাপ্তি, প্রথমপর্বের কার্যসূচীকে অনেক ভাবেই অতিক্রম করে গিয়েছিল। আগেকার বিপ্লবীদের শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু সংস্কৃতি ভিত্তিক চিন্তাভাবনা এখন আর দেখা যায়না। ধর্ম এবং সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে সেকুলার এবং রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় পর্বের সংগ্রামীরা অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পৃথিবীর অন্য দেশগুলির রাজনৈতিক দর্শন এবং আন্দোলনগুলির সঙ্গে এক করার উদ্যোগও তারা নিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন, তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করায় বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারের বিরোধিতা প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লবী সচেতনতা প্রখর হয়ে ওঠে। লাহোর এবং পেশোওয়ারের বিপ্লবীদের নেতা হয়েছিলেন মৌলভি ওবেদুল্লাহ সিন্ধি। পরে এদের অনেকেই সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্তানে চলে যান। কাবুলে যে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত হয়েছিল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (হাতরাস জমিদার বংশের) ও বরকতুল্লার প্রচেষ্টায় তাতে তারা যোগ দিয়েছিলেন (১৯১৪-১৬)।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সংগ্রামী সশস্ত্র আন্দোলন পৃথিবীর অন্যত্র ব্যাপ্ত হল। পৃথিবীর অন্যত্র যেখানে ভারতীয়দের বসবাস সেই সব দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের মনে বিপ্লবী সচেতনতা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস শুরু হল।

১৯০৪-১৯০৫ থেকেই উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর এই সব অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবীদের যাওয়া শুরু হয়েছিল। ফিজি, মালয় এই সব অঞ্চলেও ভারতীয়দের বসবাস ছিল। এদের মধ্য অনেকেই ছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ভারতীয় সেনা। নতুন দেশে, নতুন জীবন তৈরী করার অভিপ্রায়ে তারা রওনা হয়েছিলেন। পশ্চিমী আদবকায়দায় অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত এইসব ভারতীয়দের প্রতিপদে শ্বেতাঙ্গদের জাতিগত বৈষম্য ও অসহযোগিতার শিকার হতে হয়। অন্যদিকে ভারতসচিব চাইছিলেন না এইসব ভারতীয়রা পাশ্চাত্য সমাজ দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হোক, যাতে জাতীয়তাবোধে সচেতন হয়ে এরা নানা ধরনের আন্দোলন শুরু না করতে পারে। ১৯০৮ সাল থেকে ভারতীয়দের কানাডা আসার অনুমতি ক্রমশ সঙ্কুচিত করে দেওয়া হয়। তারকনাথ দাস নামে এক ভারতীয় ছাত্র 'Free Hindustan' কাগজে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর বক্তব্য হল এই যে

ফিজিতে ব্রিটিশ প্লান্টার (Planter)-দের কুলি মজুর হিসেবে ভারতীয়রে যাওয়া আসাতে ব্রিটিশ সরকার উদগ্রীব, কিন্তু উত্তর আমেরিকায় মোটেও রাজি নয়, কারণ সেখানে 'মুক্তি', 'স্বাধীনতা', ইত্যাদি চিন্তাভাবনায় তারা সংক্রামিত হতে পারে। তারকনাথ দাসের Free Hindustan-এ স্পষ্টতই জাতীয়তার সুর শোনা গেল। ১৯০৭ সালে রামনাথপুরি নামে এক রাজনৈতিক নির্বাসিতের প্রকাশিত Circular-e-Azadi তে শোনা গেল স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য। কানাডার ভ্যানকুভারে জি.ডি কুমার লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসের অনুকরণে তৈরী করে ছিলেন স্বদেশ সেবক হোম। একই সঙ্গে গুরুমুখী ভাষায় একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত। প্রথম প্রথম এই পত্রিকাটিতে সমাজ সংস্কারের কথা বলা হলেও শেষের দিকে এর লেখাগুলি ক্রমশ রাজনৈতিক চরিত্র নিচ্ছিল। এমন কি ভারতীয় সেনাদের ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও বলা হয়েছিল।

জি ভি কুমার এবং তারকনাথ দাস ভ্যানকুভার ছাড়তে বাধ্য হন। আমেরিকায় এসে সেখানকার সিয়েটল (Seattle) শহরে তারা ইন্ডিয়া হাউস নামে একটি সংগঠন তৈরী করলেন। এখানে তারা প্রতি শনিবার ভারতীয় শ্রমিকদের কাছে বক্তৃতার মাধ্যমে সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করতেন। ১৯১৩ সালে খালসা দিওয়ান সোসাইটির সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁরা ভারতবর্ষে একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। ভাইসরয় বা পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করাটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও পাঞ্জাবের সর্বত্র এরা সমাবেশে মিলিত হন। অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলিও তাদের সমর্থন করেছিল। এইভাবে দেশের বাইরের সংগঠরা, দেশের ভিতরের মানুষদের সঙ্গে সংযোগ তৈরী করেছিল। ১৯১৩ সালে ভগবান সিং নামে এক শিখ ভ্যানকুভারে পৌঁছন। ভগবান সিং খোলাখুলিভাবে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অপসারণের কথা প্রচার করতে শুরু করেন। বন্দেমাতরম বিপ্লবীদের পরস্পরের সম্বোধন ধ্বনি হবে, একথাও ভগবান সিং বলেন। ভগবান সিং ভ্যানকুভার (Vancuver) থেকে বহিস্কৃত হলে, বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু হল আমেরিকায়। এই সময় প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন লালা হরদয়াল নামে একজন রাজনৈতিক কর্মী। হরদয়াল কিছুকাল স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেছিলেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপের খবর তাঁকে উদ্দীপ্ত করে। হরদয়ালের বক্তব্য ছিল আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ নয়, আমেরিকায় ভারতীয়রা যে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা পাচ্ছে তাই ব্যবহার করা হবে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। হরদয়াল সশস্ত্র সংগ্রামে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। হরদয়ালের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি কার্যকরী সমিতি তৈরী হল এবং একটি পত্রিকাও চালু করা হল। পত্রিকার নাম গদর। সানফ্রান্সিসকো শহরে গদর পত্রিকায় কেন্দ্রীয় অফিস তৈরী হল। বিভিন্ন শহরে শহরে মিটিং এবং আলোচনাও সংগঠিত করা হল। পোর্টল্যান্ডের প্রথম মিটিং এ গদর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলনও শুরু হয়ে গেল।

১৯১৩ সালে উর্দু এবং গুরুমুখী দুই ভাষায় গদর প্রকাশিত হয়। গদর কথাটির অর্থ হল বিপ্লব,

বিদ্রোহ। পত্রিকার শিরোনামে লেখা ছিল 'আংরেজ রাজ কা দুশমন'। অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের শত্রু। প্রথম সংখ্যাটিতে ইংরেজ সরকারের শাসনের ১৪ টি ক্ষতিকরনীতি কথা লেখা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রধান ধরা হয়েছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, ভারতীয় কারিগরি শিল্পের ধ্বংস ইত্যাদি। এককথায় ইংরেজ সরকারের অপশাসনের বিবরণের যে কাহিনী ও ব্যাখ্যা জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাই সংক্ষিপ্ত আকারে গদরের প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল। গদরের প্রতিটি সংখ্যায় বারবার করে একটি বিষয়ের উল্লেখ থাকত— ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ছাপান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময় এখন উপস্থিত। এছাড়া বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (The Indian War of Independence) লেখাটি ধারাবাহিকভাবে গদর পত্রিকাতেই প্রকাশিত হচ্ছিল। লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ, বিনায়ক দামোদর, মাদাম কামা, শ্যামজীকৃষ্ণ বর্মা, অজিত সিং এদের লেখাও গদরের পাতায় প্রকাশিত হত। অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর দল, এমন কি রাশিয়ান গুপ্ত সমিতিগুলির কথাও থাকত।

গদরের প্রকাশিত কবিতাগুলির প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। 'গদর কি গুঞ্জ' নামে এগুলি ছেপে বিতরন করা হত বিনা পয়সায়। কবিতাগুলির বিপ্লবাত্মক ভাব তো ছিলই, কিন্তু বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতার সুর।

হিন্দু, শিখ, পাঠান এবং মুসলিম
এবং যারা সব সৈন্যবাহিনীতে আছো
শোনো আমাদের দেশকে লুণ্ঠন করছে
ব্রিটিশ
আমাদের যুদ্ধ করতে হবে,
এখন পন্ডিত আর কাজিকে দরকার নেই
পুজো উপাসনার সময় পার হয়ে গেছে,
এখন সময়, হাতে তলোয়ার নেওয়ার

প্রথম পর্বের ধ্যান ধারণা থেকে দ্বিতীয় পর্বের গদর বিপ্লবীদের মানসিকতা এবং চিন্তার পরিণতি যে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। গদর প্রকাশিত এই কবিতাটি থেকে বোঝা যায়। (Bipanchandra and others. Indias struggle for Independence P 150)

উত্তর আমেরিকার ভারতীয়দের মধ্যে গদর প্রচারিত হলেও পরে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, হংকং, চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ত্রিনিদাদ এবং হনডুরাসে শেষপর্যন্ত ভারতেও গদর পৌঁছে গিয়েছিল। গদরের লেখাগুলি অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া তৈরী করল। নানা জায়গায়, আলোচনা ও বিতর্ক হত লেখাগুলি নিয়ে। গদরের কবিতাগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গদর পাঞ্জাবী অধিবাসীদের চরিত্র বদলে দিল। একদা যারা ব্রিটিশ রাজের

প্রভুভক্ত ছিল, তারাই এখন বিদ্রোহী সংগ্রামী। লালা হরদয়াল অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পাঞ্জাবী তরুণদের উদ্দীপনা দেখে। এর আগে তার মনে হয়েছিল, আগামী দশ বছরের মধ্যে বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। এখন তার মনের হল দশ বছর অনেকখানি সময়, যে কোন মুহূর্তে বিপ্লব শুরু হয়ে যেতে পারে। দশ বছরের প্রতীক্ষার দরকার নেই।

১৯১৪ সালে ২৫শে মার্চ নৈরাজ্যবাদী কাজকর্মের অভিযোগে হরদয়াল গ্রেপ্তার হন। যদিও সকলেরই ধারণা, ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল এতে। জামিনে মুক্তি পেয়ে হরদয়াল গোপনে আমেরিকা ছেড়ে চলে যান। এভাবে তাঁর সঙ্গে গদর আন্দোলনের সরাসরি যোগাযোগ হঠাৎই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ঐ বছরেরই মার্চ মাসে কোমাগাতামারু নামে একটি জাহাজে কিছু ভারতীয় কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। জাহাজটি ভাড়া করেছিলেন গুরু দিৎ সিং নামে একজন ব্যবসায়ী। পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে যাত্রীরা কানাডা অভিমুখে কর্মসন্ধানে রওনা হয়েছিল। যাত্রীরা সংখ্যায় ছিল ৩৭৬ জন। এর আগে কানাডার সরকার ভারত থেকে ভারতীয়দের কানাডায় আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট সরকারের আদেশ লঙঘন করে ৩৫ জন যাত্রীকে কানাডায় আসার সুযোগ দেয়। গুরুদিত সিং এতেই উৎসাহিত হয়ে কোমাগাতামারু জাহাজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কানাডার সরকার কিন্তু যাত্রীদের অবতরণে বাধা দেয়, যাত্রীদের নামতে দেওয়া হল না। এর কারণ অনেকগুলি। প্রথম, ভারতীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে কানাডিয়ানের অনীহা ছিল, তারা মনে করছিল এতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাঘাত ঘটবে। তাছাড়া গদর কর্মীদের প্রচার এবং বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম, কানাডার সরকারকে ত্রস্ত করেছিল। কোমাগাতামারুর যাত্রীদের সঙ্গে এই ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিদ্রোহের ডাক দিলেন, বরকতুল্লা খান, ভগবান সিং, রামচন্দ্র এবং মোহন সিং ভাকনা। এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জাহাজের কোন যাত্রীকেই কোনও বন্দরেই নামার অনুমতি দেওয়া হল না। অবশেষে যখন কলকাতার বজবজ বন্দরে জাহাজ পৌঁছল ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ যাত্রীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হল। তার কারণ যাত্রীরা সরকারের ঠিক করা ট্রেনে চড়তে অস্বীকার করেছিল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল এই ট্রেনে তাদের নজরবন্দী করে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাদের অনুমান কিন্তু ভুল ছিল না। বজবজের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর পরই বিদ্রোহীদের একত্রিশ জনকে জেলে আটকে রাখা হয়, এবং বাকীদের ট্রেনে চাপিয়ে নজরবন্দী করে পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কোমাগাতামারু জাহাজের ঘটনার পরেপরেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ইংরেজদের প্রাথমিক অসুবিধার সুযোগে গদর বিপ্লবীরা আবুলান এ জঙ্গ বা যুদ্ধের ঘোষণা করল। মহম্মদ বরকতুল্লা খান, রামচন্দ্র, ভগবান সিং সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিলেন। চীন, হংকং মালয়, জাপান, সিঙ্গাপুরের ভারতীয়দের হিন্দুস্তানে গিয়ে বিপ্লবে যোগ দেওয়ার ডাক দেওয়া হল। কর্তার সিং এবং রঘুবীর দয়াল গুপ্ত ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। ভারত সরকার গদর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল। ফলে ভারতীয় অভিবাসীদের, ভারতে পৌঁছন মাত্র, সন্দেহজনক এই অভিযোগে বিরাট সংখ্যককে গ্রেপ্তার করা হল, অন্যদেরও গতিবিধি

ওপর কড়া নজর রাখা হল।

যে আশা, উদ্দীপনা নিয়ে গদর বিপ্লবীরা এসেছিলেন অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তার অবসান ঘটল। পাঞ্জাবের বেশীর ভাগ মানুষ উদ্বেলিত হলনা। সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

সাংগঠনিক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে পৌঁছলেন বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার জন্য। রাসবিহারী সেনা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলিতে গোপনে বিপ্লবী প্রচার কার্য শুরু করলেন। ঠিক হল ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ শুরু হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সি.আই.ডি বিভাগ আগে ভাগে খবর পেয়ে যাওয়ার প্রায় সমস্ত বিদ্রোহী নেতাদের সকলেই গ্রেপ্তার হলেন একমাত্র রাসবিহারী বসু পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

ইংরেজ সরকারের দমননীতি চূড়ান্ত আকার নিয়েছিল। পাঞ্জাবে মাণ্ডালে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। পঁয়তাল্লিশ জন বিপ্লবীর ফাঁসির হুকুম হয়। ২০০ জনের কারাদণ্ড হয়। এভাবে প্রায় এক প্রজন্মের পাঞ্জাবের জাতীয়তা বাদী নেতৃত্বের অবসান ঘটানো হল।

বরকতুল্লা এবং মহেন্দ্রপ্রতাপের প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত সরকার তৈরীর প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

গদর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহের সাফল্য তৈরী হল অন্যত্র। খুব সহজ ভাবে গদর বিপ্লবীরা সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষের কাছে দাদাভাই নৌরোজীর সম্পদের নির্গমণের তত্ব থেকে শুরু করে অবশিল্পায়ন, ভারতীয় অর্থনীতির অবক্ষয়ের ইতিহাস, তিলকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সম্বন্ধে সাভারকরের ব্যাখ্যা, পৌঁছে দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী অন্য সশস্ত্র বিপ্লবীদের লেখাও গদর পত্রিকায় ছাপা হত। এই লেখাগুলি একত্রিত ভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিবাদ, প্রতিকার এবং বিদ্রোহের ইতিহাস অভিবাসী ভারতীয়দের কাছে ব্যক্ত করেছিল। আধুনিক অর্থে গদর পত্রিকা এবং গদর গুঞ্জের কবিতাগুলি যথার্থ প্রচারপত্রের ভূমিকা নেয়।

গদর বিদ্রোহের দ্বিতীয় সাফল্য হল সাম্প্রদায়িক ঐক্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং ঐক্যের সচেষ্ট সচেতন এবং সফল প্রয়াস এবং রূপায়ণ তৈরী করা। গদর বিপ্লবীদের মধ্যে কোন আঞ্চলিকতার প্রবণতা ছিল না। হিন্দু পাঞ্জাবী হরদয়াল অনায়াসে বরকতুল্লার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন একই বিপ্লবী চিন্তা ভাবনায়। অন্যদিকে বাঙালী রাসবিহারী বসুকে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব দিতে তাদের দ্বিধা ছিল না। তিলক, অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল দত্ত সবাই গদর বিপ্লবীদের অনুপ্রেরণার আদর্শ ছিলেন। বাঙালী বিপ্লবীদের বন্দেমাতরম ধ্বনি তাদের পরস্পরের অভিবাদনের সম্বোধন ছিল। এভাবে জাতি ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশপ্রেমকে তারা সর্বভারতীয় চেতনায় উন্নীত করেছিলেন।

গদর বিপ্লবীরা নৈরাজ্য বাদ (anarchism), (Syndicalsim) সিন্ডিক্যালিজম সমাজবাদ্ বা Socialism,- এই সব ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ প্রেমের ধারণাকে মিলিয়ে

দেন। এটি তাঁদের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বা অন্যতম সাফল্য ছিল। মুক্তি সংগ্রামের আকাঙ্খাকে শুধু মাত্র দেশকালের সীমায় আটকে না রেখে বৃহত্তর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতীয় বিপ্লবকে তারা অন্য এবং ব্যাপকতর মাত্র দিয়েছিলেন।

গদর বিপ্লবীদের চতুর্থ সাফল্য হল, বিপ্লবের সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র তৈরী করা।

গদর বিপ্লবের প্রধান ত্রুটি হল প্রকৃত সংগঠনের অভাব। একটি বিপ্লবী আন্দোলন সফল করতে হলে যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা, নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক সাহায্য এবং যথাযথ রণকৌশল দরকার, গদর বিপ্লবীদের এর কোনটিই ছিল না। ফলে বিপ্লব সফল হল না। চূড়ান্ত দমননীতি কর্তার সিং প্রমুখ পঁয়তাল্লিশজন বিপ্লবীদের ফাঁসি, বাকী কুড়ি জনের দীর্ঘকালীন কারাবাস, প্রায় এক জন্মের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়েছিল। পাঞ্জাবে বিপ্লবের কাজে ব্যাপৃত কোন নেতাই আর রইল না। ফলে আগামী দিনগুলিতে একটা শূন্যতা দেখা গেল।

৪.২.৬ তৃতীয় পর্ব ঃ ১৯২০-১৯৩৯

সশস্ত্র সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চূড়ান্ত ভাবে দমন করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর মন্টেগু-চেমসফোর্ড (Montagu Cheimsford) আইনের সংস্কারগুলি কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সরকার বন্দী বিপ্লবীদের ছেড়ে দেয়। ১৯২০ সালে গান্ধীজীর অসহেযোগ আন্দোলন শুরু হল। গান্ধীী চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাদের তাগিদে বিপ্লবীদের কেউ কেউ এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। অন্যরা এই বিপুল আকারের এবং অভিনব গণ আন্দোলনকে সফল করার জন্য কিছুকাল সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তাভাবনা এবং কাজকে স্থগিত রাখলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, অহিংস সত্যাগ্রহের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বহুজনের মনে সংশয় দেখা দিল। অসহযোগ আন্দোলন থেমে গেল— এই পরিস্থিতিতে অনেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে ঝুঁকলেন। তবু একথা মনে রাখা দরকার ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্যসেন, যতীন দাস, যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুখদেব—পরবর্তী পর্বের সশস্ত্র বিপ্লবীরা কিন্তু প্রাথমিক ভাবে অহিংস সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগ আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২০ সালের পর থেকে একদিকে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং বিহার অন্যদিকে বাংলা, এই দুই অঞ্চল নিয়ে দুটি ধারায় সশস্ত্র বিপ্লবের পরবর্তী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দুটি ধারাতেই নতুন কিছু সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছিল। প্রথমটি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী সম্ভাবনাকে জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম করার প্রচেষ্টা দেখা গেল। দ্বিতীয় প্রভাব এল রুশ বিপ্লব এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্য থেকে। এর পাশাপাশি ভারতীয় কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীগুলির প্রভাব এবং ওয়াকার্স এ্যান্ড পেজান্টস পার্টি (Workers and Peasants Parties WWP) বা শ্রমিক, কৃষক, দলের

এই একটি সংগঠনে সংঘবদ্ধ হওয়া কম্যুনিজম, সোসালিজম, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর গুরুত্ব তৈরী করা ইত্যাদি চিন্তা ভাবনাগুলি বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ভিন্নতর পরিবেশ তৈরী করল।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে, কানপুরে, রামপ্রসাদ বিসমিল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, এবং সচ্চিদানন্দ সান্যালের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (Hindustan Republican Association) তৈরী হল। এই সংগঠনের প্রাথমিক কার্যসূচী হল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক, শাসনের অবসান ঘটানো এবং প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তৈরী করা।

একটি কার্যসূচী রূপায়িত করার জন্য, প্রচার কার্য, তরুণ ভারতীয়রে আন্দোলনে সামিল করা, এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া এই সব ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন ছিল। অর্থ সংগ্রহের জন্য হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মি (Hindustan Republican Army) কিছু সদস্য ৯ই আগষ্ট ১৯২৫ লখনউ শহরের কাছে কাকোরি নামে একটি ছোট গ্রামে আট নম্বর ডাউন ট্রেনে ডাকাতি করে, রেলের সরকারি তহবিলের টাকা লুঠ করে। কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় আসফাখউল্লা কান, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং এবং রাজেন্দ্র লাহিড়ীর ফাঁসির হুকুম হয়। বাকী চারজনকে আন্দামানে এবং সতেরোজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। চন্দ্রশেখর আজাদকে ধরা যায়নি।

কাকোরি মামলা উত্তর ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলনকে ঘোরতর আঘাত করলেও, আন্দোলনকে পুরোপুরি বন্ধ করতে পারেনি। চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্ব নতুন করে আন্দোলন শুরু হল, কিছু পরেই, উত্তরপ্রদেশে বিজয়কুমার সিনহা, শিববর্মা, জয়দেব কাহর আর পাঞ্জাবের ভগত সিং, ভগবতী চরণ ভোবা, এবং সুখদেব, পাঞ্জাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন। এই সময়ের বিপ্লবীরা সোসালিস্ট চিন্তাভাবনায় গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ৯ই এবং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলা ময়দানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনই ভবিষ্যৎ কার্যসূচী হবে, এই পরিকল্পনা নিয়ে দলের নতুন নামকরণ হল হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাব্লিকান অ্যাসোসিয়েশন অথবা আর্মি। (Hindustan Socialist Republican Association or Army) ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষ করে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সভা, মিছিল, হরতাল হয়। এরকমই একটি মিছিলে, পুলিশের লাঠি চার্জে, লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হল। পাঞ্জাবের সর্বজনপ্রিয় নেতা, শের ই পঞ্জাব লালা লাজপৎ রায়ের এ হেন মৃত্যুকে হিন্দুস্তান সোসালিস্ট দলের রোমান্টিক তরুণ নেতারা ইংরেজ সরকারের সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করল। ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮ ভগত সিং, আজাদ এবং রাজগুরু লাহোরে পুলিশ সন্ডার্সকে (Saunders) হত্যা করলে। সন্ডার্স লাজপত রায়ের ওপর লাঠি চালানোর ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। হত্যার পর হিন্দুস্তান রিপ্লাবিকান দল একটি প্রচারপত্র তুলে ধরে, তাতে বলা হল লক্ষ লক্ষ মানুষের অসীম শ্রদ্ধার নেতার মৃত্যু একজন সাধারণ পুলিশ কর্মচারীর হাতে,— এই ঘটনা সমগ্র জাতির পক্ষে অপমানজনক। ভারতের তরুণ দলের কর্তব্য এই অপমানে প্রতিশোধ নেওয়া, অপমানকে মুছে ফেলা, যে কোন ব্যক্তির হত্যাই অনভিপ্রেত। কিন্তু সরকারের অমানবিক আচরণের জন্য

এবং অন্যায় একটি ব্যবস্থার অংশীদার এই মানুষটির বিলুপ্তি একান্ত প্রয়োজন হিসেবে একে হত্যা করা হয়েছে। (Bipachandra, Indias Struggle for Independence P 249).

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আর্মির নেতারা বিপ্লবের আদর্শ সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবকে জনমুখি করতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে সরকার নিরাপত্তা এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত দুটি বিল পাশ করাতে চাইছিল। সচেতন ভারতীয়দের মনে হয়েছিল বিল দুটি সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে শ্রমিকদের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। এরই সূত্র ধরে, বটুকেশ্বর দত্ত এবং ভগত সিং ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ দিল্লীর সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এ্যাসেব্লির হলে বোমা ছুড়লেন কোন হত্যার উদ্দেশ্যে নয়। বধিত সরকারকে সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে শোনানোর জন্য, এই ঘটনাকে প্রচার কার্যের মত ব্যবহার করে, সাধারণ মানুষকে সরকারের জনবিরোধী কার্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য।

ভগত সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, সুখদেব এবং রাজগুর বিখ্যাত মামলার প্রতিদিনের কাহিনী সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বিচার চলাকালীন ভগত সিং এবং অন্যদের নির্ভীক সাহসী মনোভাব সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ভগত সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসি হয়। এর প্রতিবাদেই সারা দেশের মানুষ স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে অনুপস্থিত থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শোক পালন করে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ, অধ্যায় তৈরী করছিল। সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে রিপাব্লিকান এ্যাসোসিয়েশন নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারা তৈরী করেছল। ১৯২৫ সালে দলের ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে ব্যবস্থা মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার এবং শোষণ তৈরী করে, তার চূড়ান্ত অবসান ঘটানোই তাদের উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে বলা হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং কম্যুনিস্ট আদর্শ প্রচারই বিপ্লবীদের লক্ষ্য। দলের মুখপত্র রেভ্যুলিয়শনারি (Revultionary) তে যানবাহন ব্যবস্থা, বড় শিল্প এবং রেলপথগুলিকে জাতীয়করণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। মূল সংগঠিত সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলন তৈরী করাও দলের অন্যতম কাজ, একথাও বলা হয়েছিল।

আগেকার গোপন ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তি হত্যার কার্যসূচী বর্জন করে খোলাখুলি সশস্ত্র আন্দোলনই সঠিক পন্থা, একথা এসময়ে বিপ্লবীদর মনে হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু মুসলমান এবং অন্যধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনই হওয়া উচিৎ এমন কথাও তারা বলেছিলেন।

হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নেতা ভগত সিং ছিলেন আগেকার যুগের বিপ্লবী অজিত সিং এর ভাইপো। ভগতসিং একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব (Bolshevik) এবং সোভিয়েত আন্দোলন ইটালি এবং আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন আন্দোলনগুলি তাকে প্রভূত প্রভাবিত করেছিল। ভগত সিং এবং সুখদেব দলের সদস্যদের পাঠচক্রের মাধ্যমে নিয়মিত বিপ্লবী এবং কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় শিক্ষিত করতেন। এমন কি জেলের ভেতরেও তিনি রীতিমত একটি লাইব্রেরী তৈরী করেছিলেন এবং পাঠচক্রের ব্যবস্থা করেন। ভগত সিং মনে করতেন, যে কোন বিপ্লবে, উদ্দেশ্য চিন্তা এবং আদর্শের

ভূমিকাই মুখ্য- অতএব সেই চিন্তা এবং আদর্শকে স্পষ্ট এবং বিস্তারিত ও গভীর ভাবে জানা দরকার। সুখদেব ভগবতীচরণ ভোরা, শিব ভার্মা, বিজয় সিনহা, যশপাল প্রত্যেকেই বুদ্ধিজীবী ছিলেন। এমন কি চন্দ্রশেখর আজাদ যিনি ইংরেজী কমই জানতেন, কিন্তু চাইতেন তার কাছে স্পষ্টভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করা হোক। মূলত তার তাগিদেই ভগবতী চরণ ভোরা ফিলসফি অফ দি বম্ব (Philosophy of the Bomb) বইটি রচনা করেছিলেন। বইটিতে বিপ্লববাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পাঞ্জাব নওজোয়ান ভারত সভা বা লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের মত সংগঠনগুলি ছিল বিপ্লববাদ প্রচারের উপযুক্ত জায়গা। একক ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ নয়, সচেতন মানুষের সংগঠিত, সশস্ত্র খোলাখুলি সংগ্রাম, সঠিক পথ একথাই ভগত সিং এবং তার সহযোদ্ধাদের অভিমত ছিল।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের মতে সন্ত্রাসবাদ থেকে গণ আন্দোলনের আদর্শে পরিবর্তিত হওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাভাবিক সময়কালের প্রয়োজন ছিল, বিপ্লবীদের ব্যগ্রতা এবং অতিব্যস্ত তাগিদের কারণে তা সম্ভব হল না। তাছাড়াও দলের কর্মী নির্বাচনের সমস্যা ছিল। কর্মীদের শিক্ষিত করার মধ্যেও তাড়াহুড়োর ব্যাপার ছিল। তবু হিদুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন জাতীয়তাবাদের নতুন সংজ্ঞা তৈরী করেছিল। জাতীয়তাবাদে শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের নিপাত নয়। সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে, জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলেও সমস্ত রকম শোষণ, উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়ে সর্বব্যাপী সকল মানুষের মুক্তিই সঠিক জাতীয়তাবাদ। স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকও বটে। এভাবে ভগত সিং এবং তার সহকর্মীরা সশস্ত্র বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিলেন। মার্কসবাদী দর্শনে বিরোধী ছিলেন। ফলে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের শোষণ ও অত্যাচারের থেকে মুক্তি স্বাধীনতার যুদ্ধের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করতেন। ভগত সিংদের প্রস্তাবিত স্বাধীনতার যুদ্ধে ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং নাস্তিক ভগতসিং ধর্ম এবং কুসংস্কারের উর্দ্ধে যুক্তিবাদী চিন্তা ও বলিষ্ঠ নির্ভীক ভাবনায় সহকর্মী সহযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন।

ভগত সিং-এর ফাঁসির পরে পরেই আরেকটি ঘটনা দেশবাসীকে আলোড়িত করেছিল। জেলের ভেতরে বিচারাধীন বিপ্লবীরা জেলের অব্যবস্থা এবং একথ্য শোচনীয় অবস্থার প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিল। এই সঙ্গে তাদের দাবী ছিল, তাদের যেন সাধারণ অপরাধী নয় রাজবন্দী হিসেবে দেখা হয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর চোষট্টি দিন অনশনের পর রাজবন্দী যতীনদাসের মৃত্যু হয়। যতীনদাসের মরদেহ ট্রেনে লাহোর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার পর প্রতিটি স্টেশনে হাজার হাজার মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জমায়েত হয়েছিল। কলকাতায় ছ লাখ মানুষের আড়াই মাইল লম্বা শোভাযাত্রা তার মরদেহ অনুসরণ করে।

বাংলাতেও এইসময় বিপ্লবীরা দলবদ্ধ হচ্ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিপ্লবীদের একদল চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করে। চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দল তৈরী

হয়— সুভাষচন্দ্র বসু এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আলাদা নেতৃত্বে। অনুশীলন দলের সদস্যরা যোগ দিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর সঙ্গে। যুগান্তর দলের সদস্যরা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা, কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে অন্য আরেকজন ইংরেজকে হত্যা করলেন। বিচারে গোপীনাথ সাহা দোষী সাব্যস্ত হন এবং তার ফাঁসি হয়। এই সময় থেকে এইধরনের নির্দয়, অমানবিক বিচার এবং শাস্তির বিরুদ্ধে জনমত ক্রমশ সরব হচ্ছিল। গোপীনাথ সাহার ফাঁসি এবং সেই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে কিছুকালের জন্য বাংলার রাজনৈতিক জগতে শূন্যতা তৈরী করল। পুরোনো অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের সদস্যদের মধ্যেও কর্মসূচী নিয়ে বিবাদ হচ্ছিল। সশস্ত্র বিপ্লববাদ কি স্থগিত হল, এমন ভাবনা চিন্তা শুরু হওয়ার আগেই, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সংগ্রামী বিপ্লবের নতুন পর্ব শুরু হল। এই পর্বের নেতা হলেন মাস্টার সূর্য সেন।

চট্টগ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। এই জন্যই সেই অঞ্চলের মানুষেরা তাকে মাস্টারদা বলত। সূর্য সেন মাস্টারদা নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। প্রথম দিকে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৬-২৮ সালের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হল। প্রতিভাবান সংগঠক হিসাবে সূর্যসেনের খ্যাতি ছিল। তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় মানবিকতার বড় ভূমিকা ছিল। একজন বিপ্লবীর বড় ধর্ম হচ্ছে মানবিকতা, এ কথা তিনি সবসময়ে মনে করতেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই সূর্যসেন তার চারপাশে উৎসাহী আদর্শবাদী তরুণদের সমাবেশ তৈরী করলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল এবং আরও অনেকেই। এই দলের কার্যসূচীর প্রধান লক্ষ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরোয়া না করে মুখোমুখি সংগ্রাম শুরু করা। চট্টগ্রামকে মুক্ত স্বাধীন অঞ্চলে পরিণত করা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেললাইন উপড়ে দিয়ে চট্টগ্রামকে সমগ্র ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত দশটায় পরিকল্পনা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা এই নামে গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে প্রথম চট্টগ্রামের পুলিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয়। অন্যদিকে লোকনাথ বলের নেতৃত্বে (Auxilliary) অক্সিলিয়ারী ফোর্সের অস্ত্রাগারও আক্রমণ করা হল। কিন্তু মুশকিল হল যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী আক্রমণকারীরা অস্ত্রগুলি কোথায় ছিল তার খোঁজ পেলেন না। এর ফল শোচনীয় হয়েছিল। সেই মুহূর্তে অবশ্য সূর্যসেন 'বন্দেমাতরম' এবং 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির সঙ্গে সাময়িকভাবে বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন। সকাল হওয়ার আগেই বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর ছেড়ে আশে পাশের পাহাড়ে পালিয়ে যান। জালালাবাদ পাহাড়ের ওপরে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম শুরু হয়। যুদ্ধে বারোজন বিপ্লবীর মৃত্যু হল। এরপর সূর্যসেন চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে তার দল নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। সরকার পক্ষের তল্লাসি এবং ভয়ানক শাস্তি সত্ত্বেও গ্রামের মানুষরা, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়ে বিপ্লবীদের লুকিয়ে

রাখে। এই ভাবে প্রায় তিন বছর আত্মগোপন করে থাকার পর ১৬ই ফ্রেবুয়ারি ১৯৩৩ সূর্যসেন ধরা পড়লেন। ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সূর্যসেনের ফাঁসি হল। সহযোদ্ধাদের প্রায় সকলেরই দীর্ঘকাল কারাবাস বা আন্দামানে দ্বীপান্তর হল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী তৎকালীন বাংলায় কিংবদন্তীর মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের পর্যালোচনাতেও এই সংগ্রাম ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। বিশ শতকের তিরিশের দশককে বাংলার ইতিহাসে বিপ্লবের দশক বলে অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর পরোয়া না করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে বিপ্লবীদের বীরত্ব ও সাহসিকতার যুদ্ধ কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরত, এই সময়।

বহু তরুণ বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সংগ্রাম তখনও তীব্র; ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলের হত্যা এবং অন্তত দুজন গর্ভনরকে হত্যার চেষ্টা, এই সব ঘটনায় পরিষ্কার, বোঝা যায় সংগ্রামী বিপ্লবীরা তখনও তৎপর।

ঘটনার দ্রুততায় এবং অতর্কিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের আকস্মিকতায় ব্রিটিশ সরকারের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আতঙ্ক। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই বিমূঢ় ভাব কেটে গিয়ে প্রবল ভাবে দমননীতি প্রয়োগ করা হল। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে চট্টগ্রামে সরকারী সন্ত্রাসের শাসন শুরু হয়। অন্যত্র, সর্বত্র, নানাধরনের দমন মূলক আইন তৈরী করে, সংগ্রামী বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করার সরকারী প্রচেষ্টা চলল। সর্বভারতীয় জাতীয় নেতারাও গ্রেপ্তার হলেন। বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানানোর জন্য জওহরলাল নেহেরুকেও রাজদ্রোহিতার অপরাধে দুবছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

বিশের এবং তিরিশের দশকের বাংলার বিপ্লবীরা আগেকার ধর্মীয় বাতাবরণের বাইরে চলে এসেছিলেন। আগের মত তারা আর ধর্মীয় শপথ বা প্রতিজ্ঞা নিতেন না। হিন্দুত্বকে অতিক্রম করে মুসলমানদের সঙ্গে বিপ্লবী যোগাযোগ এই দশকের বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। চট্টগ্রাম বেভুলিউশনারী আর্মির অনেক সদস্যই ছিলেন মুসলমান। সাত্তা, মির আহমেদ, ফকির আহমদ খান, টুনু মিঞা, এরা সব সক্রিয় কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা গ্রামবাসী মুসলমানদের সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলেন। তবু কোথাও একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। বিপ্লবীরা, চাষী, শ্রমিক, অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে সামাজিক অর্থনীতিক যোগাযোগ করতে পারেন নি। এটাই তাদের ত্রুটি, ব্যর্থতা।

বিশের এবং তিরিশের দশকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটা বড় লক্ষণ ছিল তরুণ মেয়েদের বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে গৃহের অভ্যন্তর থেকে এবং বাইরের জগতেও মেয়েরা সংগ্রামী বিপ্লবের অংশীদার হয়েছিলেন। বিশ শতকের প্রথম দিকে সরলাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা বা আনি বেসান্ত (Annie Basant) পরে মাদাম কামা, বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। মাদাম ভিকাজি কামা ১৯১৮ সালে জার্মানীর স্টু গার্ট শহরের আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। মাদাম কামাই প্রথম ইউরোপের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। এ ছাড়া বন্দেমাতরম নামে একটি কাগজ লালা হরদয়ালের সহায়তায় বার করেছিলেন। লন্ডনে ফ্রি ইন্ডিয়ান সোসাইটি নামে

একটি সংগঠন করেন, উদ্দেশ্য ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের একত্রিত করার। কিন্তু ব্রিটেনের দমননীতি ও নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ফ্রান্সে পালিয়ে যান, সেখানে বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হয়। মাদাম কামা জার্মানির ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

মাদাম কামার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ শতকের বিশ এবং তিরিশের দশকে বহু মেয়ে নিজেদের বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই দুই দশকে মেয়েদের পড়াশোনাও বিস্তার পেয়েছিল। কুড়ির দশকের শেষ, এবং তিরিশের দশকে নারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত। নারীশিক্ষা ও সচেতনতা মুক্তি সংগ্রামেরই আরেকটি দিক, এবং পরিপূরক আন্দোলন এ কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই সময়। এ ব্যাপারে কলকাতার বেথুন কলেজের বিশেষ ভূমিকা ছিল। সরকারী কলেজ হিসেবে বেথুন কলেজের ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবাসিক কলেজের সুরক্ষার কারণে বহু ছাত্রী পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে পড়তে আসতেন। পূর্ববঙ্গ তখন বিপ্লবী রাজনীতির কেন্দ্রস্থল, এদের মধ্যে অনেকেই কলেজের ছাত্রী থাকাকালীনই বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট উপলক্ষে, বেথুন কলেজের ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে একজোট হয়ে হরতাল পালন করেছিলেন। শিক্ষা অধিকর্তা ওটেন সাহেবের মত জবরদস্ত মানুষের চোখ রাঙানিতেও তারা ভয় পাননি। হরতালে যোগ দেওয়ার জন্য কিছু ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে বীনা দাশ, কল্যাণী দাশ, ইলা সেনগুপ্তর নেতৃত্বে দীর্ঘকাল ব্যাপী আন্দোলন চলে। শেষ পর্যন্ত ছাত্রীরাই জয়ী হয়। কলেজের বাইরে, ছাত্রীরা সুভাষচন্দ্র এবং সরলাদেবীর সমর্থন পেয়েছিলেন। বীনা দাশ, কল্যানী দাশ, কমলা দাশগুপ্ত, ইলা সেনগুপ্ত এরা সকলেই পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবে বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। বলা যেতে পারে কলেজের ঘটনায় তাদের রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছিল।

কমলা দাশগুপ্ত বিপ্লবী দলে বোমা পাচারের কাজে যুক্ত ছিলেন। যুগান্তর দলের দীনেশ মজুমদার তার শিক্ষা গুরু ছিলেন। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীনা দাশ বি.এ. পরীক্ষার কনভোকেশনের সময় গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসেনকে (Stanley Jackson) গুলি করার প্রচেষ্টা করেন গুলি গভর্নরের গায়ে লাগেনি। কিন্তু বীণা দাশ গ্রেপ্তার হন এবং সাতবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাশের মত প্রীতিলতা ওয়াহেদ্দারও তিরিশের দশকে বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং তাদের মতই কলেজের ছাত্রী থাকাকালীন গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামী রাজনীতির আদর্শে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রীতিলতা মাস্টারদা সূর্যসেনের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা কয়েকজন বিপ্লবীদের সাথে চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ক্লাবের একজন মারা যান। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে প্রীতিলতা সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। উজ্জ্বলা মজুমদার দার্জিলিং এ গভর্নর অ্যান্ডরসন (Anderson) কে হত্যার ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে উজ্জ্বলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টের আপিলে তা কমিয়ে চোদ্দ বছর করা হয়েছিল।

শান্তিঘোষ, সুনীতি চৌধুরী ১৯৩১ সালের কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করেছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হয়েছিল ওদের। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর সুপারিশে এরা মুক্তি পেলেন। কল্পনা দত্ত মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সহযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৩৩ সালে, সুর্যসেনকে জেল থেকে বার করে আনার এক ষড়যন্ত্র কল্পনা দত্ত অন্যান্যদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেও ১৯৩৯ সালে একইভাবে গান্দীজির সুপারিশে মুক্তি পেয়েছিলেন। পরবর্তী কালের বহু সশস্ত্র সংগ্রামীদের মত কল্পনা দত্ত মার্কসবাদী রাজনীতিতে পরিবর্তিত হন।

তিরিশের দশকেই সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। সরকারের দমননীতির ফলে বিপ্লবীদের সংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৩১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, এলাহাদাবাদের একটি পার্কে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু হয়। আজাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার অঞ্চলের সশস্ত্র বিপ্লব বন্ধ হয়ে গেল। সূর্যসেনের মৃত্যু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকেও রোধ করল। জেলে, আন্দামানে, কারাবন্দী বিপ্লবীরা নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। বিপ্লবীদের বড় অংশ মার্কসবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হলেন। এরা কম্যুনিস্ট পার্টি, এবং অন্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবীদের আরেকটি দল গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগ দেন।

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে কতগুলি গুরুতর সীমাবদ্ধতা ছিল। সবচেয়ে বড় কথা এদের রাজনীতি কখনই কোন রকম গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। একমাত্র ভগত সিং ছাড়া, অন্য নেতারা বা অন্য সংগঠন গুলি এ বিষয়ে সে রকম কোন চিন্তা করেনি। সাধারণ মানুষ— কৃষক, শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং চেতনায় সংঘবদ্ধ করার কথাও ভাবা হয়নি।

তবুও ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এদের সাহস, আত্মত্যাগ, তেজ ভারতীয় চেতনায় গভীর দাগ কেটেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে এবং সম্মুখ সংগ্রাম বা আক্রমণের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারকে তারা ত্রস্ত, বিপর্যস্ত, এবং ভীত করেছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ থেকে গেছে।

৪.৩ সারাংশ

ভারতবর্ষের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সময়কাল উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, জাতীয়তাবোধ স্পষ্টভাবে সেই সময় জেগে না উঠলেও, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সংগ্রামকে যদি জাতীয়তাবোধের প্রকাশ বলা হয় তা হলে, অষ্টাদশ শতকের কিছু কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের একটি পূর্বতন ধারা আগেই ছিল।

বিশ শতকের সূচনায় চরমপন্থী থেকে পরবর্তী সংগ্রামী আন্দোলনের জন্ম হয়। বহু সংগঠন, সংবাদপত্র এবং ব্যক্তি মানুষের চিন্তাভাবনা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে পরিণত রূপ দিয়েছিল।

প্রথম পর্বে ১৯০৬-১৯১৪ এই পর্বে, মহারাষ্ট্র, বাংলা এবং পাঞ্জাবে সংগ্রামী সশস্ত্র আন্দোলনের চরিত্র ছিল এইরকম— গোপন সংগঠন ও ষড়যন্ত্র, অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে শাসকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে অতর্কিতে হত্যা করা। এই হত্যার মাধ্যমে শাসকপক্ষের মধ্যে সন্ত্রাস তৈরী করাই প্রথম পর্বের বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল। ধরা পড়ার পর তাদের বিচারকার্যের বিবরণগুলি প্রচার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম পর্বের বিপ্লবীরা হিন্দু ধর্মের গন্ডীর বাইরে যেতে পারেন নি। ধর্মের নামে শপথ এবং প্রতিজ্ঞা তাদের অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। এই পর্বের বিপ্লবীদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন বাংলার ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র, প্রফুল্লচাকী, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাষ্ট্রের চাপেকর এবং সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়।

দ্বিতীয় পর্বের সংগ্রামী আন্দোল, ভারতবর্ষ থেকে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পর্বের আন্দোলনের বিশেষত্ব হল ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস। এই ব্যাপারে গদর পত্রিকা এবং গদর আন্দোলন তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে কানাডা, আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত সন্ত্রস্ত করে রাখে। গদর আন্দোলন শুরু করেছিলেন লালা হরদয়াল। একই সময় কোমাগাতামারু জাহাজের ঘটনা, এবং বজবজের যুদ্ধ, সংগ্রামী আন্দোলনকে অন্য এবং ব্যাপকতর মাত্রায় নিয়ে যায়।

তৃতীয় পর্বের সূচনা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এই পর্বের নায়ক হলেন ভগত সিং, এবং তার সহযোদ্ধারা। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন সশস্ত্র বিপ্লবকে কম্যুনিস্ট দর্শনের প্রভাবে সকল শ্রেণীকে একত্রিত করে মুখোমুখি সংগ্রামে পরিণত করেছিল। বাংলায় সূর্যসেন, মাস্টারদা, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত, চট্টাগ্রাম বাহিনী তৈরী করে সংঘবদ্ধ লড়াইতে চট্টগ্রাম স্বাধীন করার প্রচেষ্টা নেন।

তৃতীয় পর্বের সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জাতীয় সংগ্রামে, মেয়েদের অংশ গ্রহণ। বহু অল্পবয়েসী মেয়েরা, সরাসরি লড়াইতে, অথবা, বোমা, রিভলবার পাচারের কাজ করে বিপ্লবের অংশীদার হন।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অনেক ত্রুটি ছিল। তবু কংগ্রেস পরিচালিত মূলধারা জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তৈরী করেছিল। বস্তুত ইংরেজ সরকারকে সশস্ত্র বিপ্লবীরাই সন্ত্রস্ত ও ভীত করেছিল। এখানেই সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্য।

৪.৪ অনুশীলনী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন—

১। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের পটভূমি আলোচনা কর।

২। সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্বের আলোচনা কর।

৩। বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে গদর আন্দোলনের ভূমিকা কি ছিল?

প্রবন্ধ রচনা কর—

১। হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন এবং ভগৎ সিং।

২। চট্টগ্রামে অভ্যুত্থান ও চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা।

৩। সংগ্রামী বিপ্লবী আন্দোলনে ইতিহাসে মেয়েদের ভূমিকা।

টীকা লেখো—

(ক) মাদাম কামা, (খ) প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, (গ) চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়, (ঘ) অনুশীলন ও যুগান্তর, (ঙ) বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, (চ) শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, (ছ) বাঘা যতীন, (জ) ক্ষুদিরাম, (ঝ) মারাঠা ও কেশরী, (ঞ) ভবানী মন্দির, (ট) সরলা দেবী, (ঠ) ওকাকুরা, (ড) গদর কি গুঞ্জ।

দু এক কথায় উত্তর দাও।

(ক) 'মিত্রমেলা' কারা স্থাপন করেছিলেন এবং কোথায়?

(খ) বালসমাজ ও আর্যবান্ধব সমাজ কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

(গ) 'অনুশীলন সমিতি' প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন কে ?

(ঘ) 'গদর শব্দের অর্থ কি?

(ঙ) 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকেশন এ্যাসোসিয়েশন' এর মুখপত্রের নাম কি ছিল?

(চ) কোন বিখ্যাত বিপ্লবী জাপানে পালিয়ে যান?

(ছ) বীনা দাশ কাকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেন, এবং কোথায়?

(জ) কল্পনা দত্ত পরবর্তী জীবনে কোন রাজনৈতিক দর্শন গ্রহণ করেন?

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. Biopan Chandra, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, K.N. Panikkan, Sucheta Mahajan : India struggel for Independence, Penguin Books, 1989.
2. সুপ্রকাশ রায়. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, DNBA Brothers কলকাতা ১৯৭০।
3. কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬৪।